সঙ্কলন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

সঙ্কলন

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে চয়ন করিয়া একখানি কবিতার বই "চয়নিকা" অনেকদিন হইল বাহির করা হইয়াছে এবং ইহার অনেকগুলি সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গদ্য গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোনো বই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এইবার আমরা গদ্য গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া "সঙ্কলন" বাহির করিতেছি। গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন আর সকল রকম লেখাই ইহাতে আছে। কোনো বইতে এখনও গ্রথিত হয় নাই এমন লেখাও "সঙ্কলনে দেওয়া হইল। লেখাগুলি বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া লেখার তারিখ অনুসারে সাজানো হইয়াছে।

৯ই আগষ্ট, ১৯২৫।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

১ম সংস্করণ (২১০০) ... ১৩৩২ সাল।
২য় পুনর্মুদ্রণ (২১০০) ... ১৩৩৩ সাল।
৩য় পুনর্মুদ্রণ (২১০০) ... ১৩৩৪ সাল।
৪র্থ পুনর্মুদ্রণ (২১০০) ... ১৩৩৫ সাল।
৫ম পুনর্মুদ্রণ (২১০০) বৈশাখ, ১৩৩৯ সাল।

মূল্য—১৸৵০

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

সঙ্কলন

—··:*:—

শিক্ষার হের-ফের

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে-তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে-তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্ম্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন-পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে

হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে উৰ্দ্ধশ্বাসে, দ্রুতবেগে, দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো-কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো সখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালীর ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ, অভিধান এবং ভূগোল-বিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালীর ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই! অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্ব্বণ করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মস্‌লা মিশানো নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধূলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি-এ এম-এ পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত, কথা-বার্ত্তা এবং আচার অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেই জন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ

লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল-লাভ করে।

কিন্তু এই মানসিকশক্তি হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালী কী করিয়া এড়াইবে কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এক তো ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগা-গোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্ব্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।

আবার নীচের ক্লাসে যে-সকল মাষ্টার পড়ায় তাহারা কেহ এণ্ট্রেন্স-পাশ, কেহ বা এণ্ট্রেন্স-ফেল ; ইংরেজি ভাষা, ভাব, আচার-ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনই সুপরিচিত নহে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না। Horse is a noble animal বাংলায় তর্জ্জমা করিতে গেলে বাংলার-ও ঠিক থাকে না, ইংরেজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায় ? ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো—কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপূত রকম হয় না, এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরেজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন যে চলে তাহার আর সীমা নাই ; ফলত অল্পবয়সে আমরা যে-ইংরেজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত

ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনোপ্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়—কেহ তাহা প্রত্যাশাও করে না। মাষ্টারও বলে ছাত্রও বলে, আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া বুনিয়া কোনো মতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ-যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাশ হই; আপিসে চাকরি জোটে।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কী? যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত, গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, প্রকৃতি-জননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরেজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্য-রাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল।

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চ্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না ও-কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরেজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য ইংরেজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে

দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না, ইহার অর্থ এই যে স্তূপ উঁচা করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মাণ করিতেছি না। মালমস্‌লা যাহা জড় হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট পাট্‌কেল পূর্ব্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্ম্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয় সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্ম্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনি কাজটা পাকা রকমের হয়।

অতএব ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনা-শক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবলি লাঙ্গল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলা-ভাঙ্গা, কেবলি ঠেঙা লাঠি, মুখস্থ এবং এক্‌জামিন্—আমাদের এই "মানব-জনম" আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে, যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে, এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সঙ্গে, রস থাকা চাই। কারণ মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে-সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না। বয়োবিকাশেরও তেম্‌নি একটা বিশেষ সময় আছে যখন সজীব ভাব এবং নবীন কল্পনা-সকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পসলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ"। নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে, যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখনি যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্ব্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে—কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও, য়ুরোপীয় সাহিত্যের নব নব সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রবেশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া।

এইরূপে বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রং মাখিয়া উল্কি পরিয়া পরম গর্ব্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং

লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতী বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলা সস্তা বিলাতী কাচখণ্ড পুঁতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতী সাজ-সজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা সস্তা চক্‌চকে বিলাতী কথা লইয়া ঝল্‌মল্‌ করিয়া বেড়াই এবং বিলাতী বড়ো বড়ো ভাবগুলি লইয়া হয় তো সম্পূর্ণ অযথাস্থানে অসঙ্গত প্রয়োগ করি, আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কী একটা অপূর্ব্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব শিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে-ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে-গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্য্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্ম্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের

তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই ; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে ; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল আমাদিগকে কেরাণীগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র। এই জন্য যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরন্তন কুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন ; একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন ; একদিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্যদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না ; কেবল ধনোপার্জ্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত, তখন আর আশ্চর্য্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

এইরূপে জীবনের একতৃতীয়াংশ কাল যে-শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব !

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্ব্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে ?—বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত

অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করাইয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত, বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবন-ধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্য্যমুখী কমল-মণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালী-পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

* * * * *

যে-দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র

লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি—দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হের ফের ঘুচাইয়া দাও! আমি যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হের-ফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য, নহিলে আছে সকলি। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাই, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন

পানীমে মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানীও আছে পিয়াসাও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে, এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

(১২৯৯)

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে—সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

কলেজের বাহিরে যে-দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগস্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।

প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, অতএব আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে আলোচ্যবিষয় করিয়া লইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের অবেক্ষণ-শক্তি ও মনন-শক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে।

ছাত্রেরা কেবল পরের কাছ হইতে শিক্ষা করিবে কিন্তু শিক্ষার বিষয়কে নিজে গড়িয়া তুলিতে পারিবে না এরূপ ভীরুতা যেন তাহাদের মনে না থাকে। দেশের সাহিত্য রচনায় সহায়তা করিবার ভার তাহারাও গ্রহণ করিতে পারে।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই, যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্র-সমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহে ইহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে আমরা সার্থক হইব। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা, তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহাদের তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবর রাখেন না। তাঁহারা এ-কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জন সম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে। আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে—নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে অনবরতই পরিবর্ত্তনের কাজ করিতেছে, সে পরিবর্ত্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু-যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না—

যেখানেই হোক্ না কেন মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে, —পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। ছাত্রগণ যদি স্ব-স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnologyর বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত্ত, পোদ, বাগ্‌দি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত-বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত-বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্ব্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান

প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।

* * * * *

আমাদের প্রথম বয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন, তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই—লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গাড়িবল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাট্রিয়টিজমের ভাবরস-সম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশ-হিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে-দেশ প্রত্যক্ষ, তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশ-হিতৈষী হইতেছিলাম।

"আইডিয়া" যত বড়োই হোক্, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হোক্, দীন হোক্, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারত-মাতা যে, হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণসুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ-কথা ধ্যান করা নেশা-করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্যভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ

দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষ-মূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণ চীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরাণীগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্দ্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

*   *   *   *   *

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ যে কী তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্ককেশের নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে-তারে সহজে বাজিয়া উঠে, তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ণ, সেই প্রভাতসূর্য্যরশ্মি-নির্ম্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই—উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্ব্বিচারে আত্মবিসর্জ্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে—আমি জানি, ইতিহাস-বিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশ-হিতের জন্য, লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত

স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমর-মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে, তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প, অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বত বর্গের নামে আহ্বান করিতেছি—ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্ম্মের পথে। দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্ব্বণে, ব্রতকথায় পল্লীর কৃষিকুটীরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য, তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি; এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে; তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্ব্বলতার অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জ্ঞানীসভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে। কর্ম্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে—কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষা পাত্র লইয়া নহে—গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতে হয়;—এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নতব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন, সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট।

(১৩১২)

শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষীকে বিদ্যা শিখাইলে তা'র চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তা'র হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, যখন দেখি সে জাগার প্রয়োজন। এবং তা'র চেয়ে আরো বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলা দেশের এক কোণে যে-ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে যুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎ-জোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনে করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সঙ্কীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাবিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। আমাদের বিলাতী বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিষ হইয়া সাইন্‌বোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিষ আছে তা'র অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে ; সে কি চিন্তায়, কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিষটা বিদেশী। একথা মানি না। যা সত্য তা'র জিয়োগ্রাফী নাই ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয় একথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তা'র বাহন পায় নাই—তা'র চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্ব্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্যদেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখ্‌লে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলা দেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলা দেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল

হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলা দেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তা'র উল্‌টো দিকে গজাইবে।

যে সর্ব্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তা'র সাড়া পাওয়া গেল না, তা'র উপরে আবার আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। একদিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্যদিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সঙ্কীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরো সঙ্কীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সেদিকে কড়া দৃষ্টি।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার একথা মানি, কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবী করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরী করার মতো হইবে।

আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলাপাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খ'ড়ো ঘরে মানুষ,—এদেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে একথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্ব্বে দেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই

করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল-হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতীর তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্য্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে-অংশটা দেহের উত্তাপ সঞ্চারের জন্য তা'র অনেকটার বরাৎ পাকশালার ও পাকযন্ত্রের পরে নয়, দেবতার পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা এক রকম দাঁড়াইয়া গেছে—শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়—উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্ব্বল।

দৈন্য জিনিষটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে! সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিষ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ হইতেছে, গান বাজনা, আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, শিক্ষা, দীক্ষা, রাজশাসন, আইন আদালত সভ্য-দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে। এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক—এই বিপুল ভার বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে, ক্ষমতা প্রকাশ পায় না,—এইজন্য

বর্ত্তমান সভ্যতাকে যে-দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন ইহা অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো, তা'র হাত পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে ;—সে জানেও না এত বেশি হাঁসফাঁস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুস্কিল এই-যে দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রচণ্ড জোরে হাত পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

* * *

শিক্ষার জন্য আমরা আব্দার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষা-বিস্তারে আমাদের গা নাই। তা'র মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্য্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তা'র সর্ব্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া সহরের ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা সহরেই আট্কা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্য্যন্ত এ অসুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই সহরটাকে দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্য্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনো দিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিষ করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তা'রা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ জাপানী ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানীর সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেম্‌নি করা, তেম্‌নি তার ফল-লাভ। আমরা ভরসা করিয়া এপর্য্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালীকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্—সমস্ত বাঙালীর প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালীর এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসী জর্ম্মাণ শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালী ইংরেজি শিখিবে

না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিম্বা অর্দ্ধাশনই ব্যবস্থা এ কথা কোন্ মুখে বলা যায়?

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তা'র কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি পেটাপেটি করিতে হয় —সে খুব শক্ত হাতের কর্ম্ম। আশু মুখুজ্জে মশায় ওরি মধ্যে এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তা'র ভিতরকার কথা এই,—বাঙালীর ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক্ বাংলা না শিখিলে তা'র শিক্ষা পূরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরি বিদ্যাকে চৌকষ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো স্বাভাবিক নির্ম্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না—একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল পরামর্শ দাও, অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়। অত্যন্ত বেশি আশা চুলোয় যাক, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। অতএব পরামর্শে নামা যাক্।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন পাশের কুস্তির আখ্‌ড়া ছিল। এখন আখ্‌ড়ার বাহিরেও ল্যাঙোট্‌টার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁপ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছু-দিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন,—এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্জে মহাশয়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের

আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক,—কেবল তা'র এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আমদরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালীর জিনিষ করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহূত যারা তা'রা ভিতর বাড়িতেই বসুক—আর রবাহূত যারা তা'রা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক্ না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল না হয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দারোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে। অভিশাপ লাগিবে না কি?

এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তা'রা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

সহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। সহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর একটা সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমাদের যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তা'রা কোনোমতে এন্‌ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়—উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে-ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর

নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়—গরীবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়;—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তা'রা শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়—কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তা'রা এই রুদ্ধভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালীর ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তা'রা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তা'রা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলণ্ডে এক দিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মূলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত—কিন্তু এ-যে তা'র চেয়ে কড়া আইন। এ-যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্য্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তা'র চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণ-শক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাশ করে তা'রা অসভ্যরকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

যাই হোক্ ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার পুলটাই না হয় ফু-ফাঁক হইল, কিন্তু কোনোরকমে সরকারী খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না? ষ্টীমার না হয় তো পান্সী?

ভালোমতে ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যান্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজসভার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক্—বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক্ না কিন্তু গরীবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষার উচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখিন লোকে সখ করিয়া তা'র

কেয়ারি করিবে,—কিম্বা সে অগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের ফুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে।

বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না। এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তা'র প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা-রচনা ও সঙ্কলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দু'পাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য্য। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হুঁচট্ খাইতে খাইতে চলে, তখন চার ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে,—ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। অথচ যে সব বাঙালী কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে?

জার্ম্মানীতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তা'রা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর

নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে?

তা'র ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোষাকী ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তা'র পকেটের সঞ্চয় আলনায় ঝোলানো থাকে, তা'র পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজাউজীর মারি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তা'র হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেম্‌নি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তা'র সমস্ত আমাদের সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তা'র প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্ত্তি করে, দেহপূর্ত্তি করে না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা ডিগ্রির টাকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুস্কিল এই যে আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে ঢালাই-করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত।

সেইজন্য ছাঁচে ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই—ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালী অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কি না, ইংরেজি চালুনীর ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তা'র চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তা'র একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রি লইতেই হয়—কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিম্বা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তা'রাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয় যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রি লইতেছে তা'রাও অবকাশমতো বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দু'দিন না যাইতেই দেখা যাইবে এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধূলা উড়াইয়া আঁখি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এম্‌নি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা সাহিত্যের

ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল ;— তখন তা'র ক্ষুদ্রতাকে, তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল ; কিন্তু সে-যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয় ; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালীর ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদীর রাজদ্বারে ছিল না—আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়—বাহিরের সেই সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতী বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তা'র দুটা কারণ আছে। এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ-বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, মন কিছুতেই ঐ ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিষকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া বিরোধ না করিয়া কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয়দান করিবে।

কিন্তু ঐ কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা

দেশের আপিস আদালত, পুলিসের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া থাক্ না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে, ছায়া চাহিতেছে, সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি না কেন? গুরুর চারিদিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা তক্ষশিলা, ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোককে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক্ না কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—"আমরা চাই।" এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশের যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

(১৩২২)

শিক্ষার মিলন

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সে দিকে তা'র বাঁধা নিয়মের একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তু-বিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি ক'রে বা মূর্খতা ক'রে যে তা'কে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে; অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেচে শুধু যে বস্তুর বাধা তা'র কেটেচে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তা'র সহায় হ'য়েচে, বস্তু বিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চ'ল্‌বার বিদ্যা তা'র হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌছতে পারে ব'লে বিশ্ব ভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তা'রই পাতে; আর পথ হাট্‌তে হাট্‌তে যাদের বেলা ব'য়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের জন্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে-বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় ক'রেচে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়্‌তে থাক্‌লে দুঃখ ক'মবে না, কেবল অপরাধ বাড়্‌বে। কেননা বিদ্যা যে সত্য।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাক্‌তে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর ক'রে নিয়মকে চেপে ধ'রেচে, আর তা'রা বাইরের জগতের সকল সঙ্কট ত'রে যাচ্চে। এখনো যারা বিশ্ব-ব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার ক'র্‌তে ভয় পায়, এবং দায়ে ঠেক্‌লে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাইরের

বিশ্বে তা'রা সকলদিকেই মার খেয়ে ম'র্‌চে তা'রা আর কর্তৃত্ব পেলো না।

আজ একথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্ব-শক্তি হ'চ্চে ত্রুটি-বিহীন বিশ্ব নিয়মেরই রূপ ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে ; এইজন্যে, এই নিয়মের পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত—এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্ম-শক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্ব-ব্যাপারে যে-মানুষ আকস্মিকতাকে মানে, সে নিজেকে মান্‌তে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে ; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্ব-ব্যাপারে তা'র নিজের বুদ্ধি খাটে না, তখন সে আর সন্ধান ক'র্‌তে চায় না, প্রশ্ন ক'র্‌তে চায় না,—তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায় ; এইজন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠ'ক্‌চে, পুলিসের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্য্যন্ত। বুদ্ধির ভীরুতাই হ'চ্চে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিম দেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হ'তে আরম্ভ হ'য়েচে কখন থেকে ? অর্থাৎ কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেচে যে রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের খেয়ালের জিনিষ নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে ? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত ক'রেচে, যখন থেকে তা'রা জেনেচে সেই নিয়মই সত্য যে-নিয়ম ব্যক্তি-বিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি ক'র্‌তে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, "সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগ্‌লো,

একখানা চালাও বাঁচাতে পার্‌লিনে কেন?" তা'রা ব'ল্‌লে "কপাল!" আমি ব'ল্‌লেম "কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একটা কুয়ো দিস্‌নে কেন?" তা'রা তখনি ব'ল্‌লে, "আজ্ঞে, কর্ত্তার ইচ্ছে হ'লেই হয়।" যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব্, তাদেরই জল-দান ক'র্‌বার ভার কোনো একটি কর্ত্তার। সুতরাং যে-ক'রে হোক্ এরা একটা কর্ত্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোনোকালেই কর্ত্তার অভাব হয় না।

বিশ্ব-রাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে ব'সে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম ক'রে দিয়েছেন। এই নিময়কে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে-কর্ত্তৃত্ব পেতে পারি তা'র থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত ক'র্‌তে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে ব'লেছেন, যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অর্থের বিধান তিনি যা ক'রেছেন সে বিধান যথাতথ, তা'তে খাম্‌খেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বতকালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হ'চ্চে অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্য পাকা ক'রে দিয়েছেন। এ না হ'লে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হ'য়ে দুর্ব্বল হ'য়ে থাক্‌তে হ'তো; কেবলি এ-ভয়ে ও-ভয়ে সে-ভয়ে পেয়াদার ঘুস জুগিয়ে ফতুর হ'তে হ'তো। কিন্তু তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে যে-দলিল, সে হ'চ্চে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল,—তা'রই মহা আশ্বাসবাণী হ'চ্চে যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান ক'রেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন:—"বস্তুরাজ্যে আমাকে না হ'লেও

তোমার চ'ল্‌বে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম, একদিকে রইলো আমার বিশ্বের নিয়ম, আরেক দিকে রইলো তোমার বুদ্ধির নিয়ম ; দুয়ের যোগে তুমি বড়ো হও,—জয় হোক্ তোমার,—এ রাজ্য তোমারই হোক্—এর ধন তোমার,অস্ত্র তোমারই।"এই বিধি-দত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ ক'রেছে অন্য সকল স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে-লোক কর্ত্তাভজা, পোলেটকাল বিভাগেও কর্ত্তাভজা হওয়া ছাড়া তাদের আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্ত্তৃত্ব দাবী করেন না, সেখানেও যারা কর্ত্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে, তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আম্‌দানী হবে, কেবল ছোট্ট ঐ "স্ব"টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

এই পর্য্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সাম্‌নে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়—"সব মান্‌লেম, কিন্তু পশ্চিমের যে-শক্তিরূপ দেখে' এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ ?" না, পাইনি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্য্যের দানব-পুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে ব'ল্‌ছিনে—ইংরেজিতে ব'ল্‌তে হ'লে হয়-তো ব'ল্‌তেম্, titanic wealth। অর্থাৎ যে-ঐশ্বর্য্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জান্‌লার কাছে রোজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ-তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সাম্‌নে ব'সে থাক্‌তেম আর মনে মনে ব'ল্‌তেম, লক্ষ্মী হ'লেন এক, আর কুবের হ'লো আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হ'চ্চে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে ; কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্চে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবলি লম্বা হ'তে থাকে। এ

নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে প'ড়ে গেছে, তা'র রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হ'য়ে উঠে, বাহাদুরীর মত্ততায় সে ভোঁ হ'য়ে যায়।

আটলান্টিকের ও-পারে ইট-পাথরের জঙ্গলে ব'সে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হ'য়ে ব'লেছে—"তাদের খচ-মচের অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়?" আরো চাই, আরো চাই—এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটি-কুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্যের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে ব'লেছে "ততঃ কিম্!"

এ কথা বারবার ব'লেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম ক'রে শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে। আমি এই বলি,—অন্তরে গান ব'লে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তা'র সাধনায় সুর ও তাল দুয়েরই চেষ্টা থাকে রসের সংযম রক্ষার—বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম ব'লে সত্যটি যদি থাকে তবে তা'র সাধনায় ভোগকে হ'তে হয় সংযত, সেবাকে হ'তে হয় খাঁটি। এই সাধনায় সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম, সেই হ'লো প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন, সেই হ'লো প্রকৃত মিলন।

পূর্ব্বে যা ব'লেছি তা'র থেকে একথা সবাই বুঝবেন-যে আমি বলিনে রেলোয়ে টেলিগ্রাফ কল-কার্‌খানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা'র বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তা'র উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তা'র অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ, এইখানে তা'র প্রাচীর তা'র পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায়; সুতরাং

এইখানেই তা'র লড়াই। সেখানে তা'র অমৃত, যেখানে মানুষ—বস্তুকে নয়—আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে, সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না, সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড়ো লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের পরে যে-নিয়ম চালনা করে, সে-নিয়ম যদি পাকা হয় তাহ'লে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের তো পাকা নিয়ম নেই। তা'র বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চায়ের আয় নেই, ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্ব-নিয়মের দলে, সেইজন্যে সেটা চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু যদি এমন ধারণা হয় যে ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরাট সত্যের অঙ্গ নয়, তাহ'লে সেই ধারণায় মানবত্বকে শুকিয়ে ফেলে। কলকে তো আমরা আত্মীয় ব'লে বরণ ক'রতে পারিনে; তাহ'লে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে-আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়?

যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাইরে বড়ো ক'রে তোলায় পশ্চিম সমাজে মানব-সম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘ'টেছে। কেননা স্ক্রু-দিয়ে-আঁটা আঠা-দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান ক'রে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন বন্ধন শিথিল হ'তে থাকে। অথচ মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্বজুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ ক'রে কোঠাবাড়ি ওঠে।

কেননা পূর্ব্বেই ব'লেছি বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিষটা সত্য। সেইজন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় তা'রা যতই ফল-লাভ করে ফল-লাভের দিকে তাদের লোভের ততই অন্ত থাকে না।

লোভ যতই বাড়্‌তে থাকে, মানুষকে মানুষ খাটো ক'র্‌তে ততই আর দ্বিধা করে না।

ভক্তি নেই ব'লেই মানুষের বাঁধন দড়ির-বাঁধন হয়, কিন্তু দড়ির-বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিম দেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হ'য়ে ঘনিয়ে এসেছে একথা সুস্পষ্ট। ভারতে আচারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক ক'র্‌তে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্য সমাজকে নির্জ্জীব ক'রেছে আর য়ুরোপে ব্যবহারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক ক'র্‌তে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্য সমাজকে সে বিক্ষিপ্ত ক'রেছে।

তাহ'লে চরিতার্থতা কোথায়? তা'র উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। আপেল পড়ার অন্ত-বিহীন সংখ্যা-গণনার মধ্যেই আপেল-পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় একথা যে বলে, প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তা'র মন ধাক্কা দিয়ে ব'ল্‌বে, "ততঃ কিম্!" তা'র দৌড়ও থাম্‌বে না, তা'র প্রশ্নের উত্তরও মিল্‌বে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল-পড়া যেম্‌নি একটি আকর্ষণ-তত্ত্বে এসে ঠেকে, অম্‌নি বুদ্ধি খুসি হ'য়ে ব'লে ওঠে, "বাস্, হ'য়েছে।"

এই তো গেল আপেল-পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্‌সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপ প্রকাশ কি অন্ত-হীন সংখ্যায়?

তা নয়, এই প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ ব'লেছেন—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্ব্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতের

মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে, সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে, সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রী-বুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্য-তত্ত্ব চীনকে অমৃত দান ক'রেছিল। আর যে-বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এলো, এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না, সে অকুণ্ঠিত-চিত্তে চীনকে মৃত্যুদান ক'রেচে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হ'য়েছে এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হ'চ্ছে জড়-বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হ'চ্ছে সাধনার সব নীচেকার ভিত— কিন্তু এটা পাকা ক'র্তে না পার্লে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামী ক'র্তে ব্যস্ত থাক্বে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এমনি ক'রে মাটির দিকে ঝুঁকে প'ড়েছে যে, উপর পানে মাথা তোল্বার ফুরসৎ তা'র নেই ব'ল্লেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠ্বে তখনই, হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত, তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা ব'লেছেন, "না জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি।" বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়ম তত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্যবন্ধন কল্পনা করি সে-ও মায়া,—এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিম মহাদেশ বাহ্যবিশ্বে মুক্তির সাধনা ক'র্ছে সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে

বের ক'রে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা, এই হ'চ্চে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা ক'র্‌বার চেষ্টা। আর পূর্ব্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে-সাধনা ক'রেছে সেই হ'চ্চে অমৃতের অধিকার লাভ ক'র্‌বার উপায়। অতএব পূর্ব্ব-পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহ'লে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-মন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন—ব'লেছেন—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এইখানে বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা ঋষি বলেছেন। এই মিলনের অভাবে পূর্ব্ব দেশ দৈন্য পীড়িত ও নির্জ্জীব; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝ্‌বার আশঙ্কা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে ব'লেছি সেইটে আরেকবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তা'রাই এক হ'তে পারে। পৃথিবীতে যারা পর-জাতির স্বাতন্ত্র্য হরণ করে, তা'রাই সর্ব্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজম হ'চ্চে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক-করা ব'লে প্রচার করে। পূর্ব্বে আমি ব'লেছি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ ক'রে বসে তাহ'লে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাক্‌লে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেম্‌নি মানুষ যেখানে এক সেখানে তা'র সত্য ঐক্য পাওয়া যায়।

সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা ক'র্‌তে হবে, আর তাদের মনে রাখ্‌তে হবে এই সাধনায় জাতি-বিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে, ন ততো বিজুগুপ্সতে, তা'রাই প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি মানুষের দল পর্ব্বত-সমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হ'য়েছে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হ'তে না পারে, তাহ'লেই সে সত্য হ'তে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলি হানাহানি ক'রেছে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত ক'র্‌তে গিয়েছে, তা'রা কোন্ কালে লোপ পেয়েছে। আর যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখ্‌তে চেয়েছিল, তা'রাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুট্‌লো, অম্‌নি মানুষের সত্যের সমস্যাও বড়ো হ'য়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক-শক্তি যাদের একত্র ক'রেছে তাদের এক ক'র্‌বে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হ'লো তো ভালোই, নইলে সে দুর্য্যোগ। সেই মহাদুর্য্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্য-শক্তি হু-হু ক'রে এগ'লো, এক ক'র্‌বার অন্তর-শক্তি পিছিয়ে প'ড়ে রইলো।

আজ জাতিতে জাতিতে একত্র হ'চ্চে অথচ মিল্‌ছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তা'র কারণ এই যে, গণ্ডীর ভিতরে যারা এক হ'তে শিখেছিল, গণ্ডীর বাহিরে তা'রা এক হ'তে শেখেনি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় ব'লেই সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডীর পূজা ধরে; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে; রাজাকে ভোলে, দারোগাকে কিছুতে ভুল্‌তে পারে না।

পৃথিবীতে নেশন গ'ড়ে উঠ্‌লো সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডী-দেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারিদিক থেকে নরবলির জোগান্ চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। যতদিন বিদেশী বলি জুট্‌তো ততদিন কোনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি প'ড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগ্‌তে আরম্ভ হ'লো,—"একেই কি বলে ইষ্টদেবতা? এ যে ঘর-পর কিছুই বিচার করে না।" এ যখন একদিন পূর্ব্বদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত ব'সিয়েছিল এবং "ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায়, ধরি' ধরি' চিবায় সমস্ত"— তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জ'মেছিলো, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবছে, এর পূজো আমাদের বংশে সইবে না। যুদ্ধ যখন পূরোদমে চ'ল্‌ছিল তখন সকলেই ভাব্‌ছিল যুদ্ধ মিট্‌লেই অকল্যাণ মিট্‌বে। যখন মিটলো তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধি-পত্রের মুখোস প'রে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড ল্যাজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁৎকে উঠেছিল, আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই ল্যাজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধি-পত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চ'ল্‌ছে, বোঝা যাচ্ছে ঐটাতে আগুন যখন ধ'র্‌বে তখন কারো ঘরের চাল আর বাকি থাক্‌বে না। পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে ব'লছেন যে, যে-দুর্ব্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি, এত মারের পরেও তা'র নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্ব্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশন্যালিজ্‌ম্, দেশের সর্ব্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হ'লো রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্‌টোদিক, অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েছে এই কথাটা যখন অস্বীকার ক'র্‌বার জো নেই, এত বড়ো সত্যের উপর যখন কোনো একটা-মাত্র প্রবলজাতি আপন

সাম্রাজ্য-রথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় এ-কে ধূলো ক'রে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার ক'র্তেই হবে।

বর্ত্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার সঙ্গতি হওয়া চাই। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্ব্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ ক'র্বে। যে-সকল রিপু যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচার-পদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামীকালের জন্যে আমাদের অযোগ্য ক'রে তুল্বে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে, একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে-মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হ'চ্চে ভেদবুদ্ধি দূর ক'র্বার মন্ত্র। শুনতে পাচ্চি সমুদ্রের ও-পারের মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'র্ছে, "আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্ম্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল, যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?" তা'র উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছক্, যে, "মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তা'র থেকেই শোক।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।"

আমরা শুনতে পাচ্চি সমুদ্রের ও-পারে মানুষ ব্যাকুল হ'য়ে বল্ছে "শান্তি চাই"। এ কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা ব'লেছেন "শান্তং শিবমদ্বৈতং", অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে-আবর্জ্জনাভার সরিয়ে ফেল্বার

জন্যে আজ রুদ্র দেবতার হুকুম এসে পৌঁছেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগ্‌তে সুরু ক'রেছে, আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জ্জনার পীঠ স্থাপন ক'রে আজ যুগান্তরের প্রত্যুষেও তামসী পূজা-বিধি দ্বারা তা'র অর্চ্চনা ক'র্‌বার আয়োজন ক'র্‌তে থাকি। যিনি শান্ত, তিনি শিব, যিনি সার্ব্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যান মন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যান-মন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাত-রশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্বোধন এনে দেবে না?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যা-নিকেতনকে পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন ক'রে তুল্‌তে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়-লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি, সহজে মিট্‌তেও চায় না। সত্য লাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে-গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য ক'র্‌তে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজন-শালা নিয়ে চ'ল্‌বে না, তা'র অতিথিশালা চাই, যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা ক'রে সে ধন্য হবে। শিক্ষা-ক্ষেত্রেই তা'র প্রধান অতিথি-শালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে শিক্ষার যত কিছু সর্‌কারী ব্যবস্থা আছে তা'র পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যা-ভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি, আতিথ্য করে না ব'লে লজ্জা করাও তা'র ঘুচে যায়। সেই জন্যই বিশ্বের আতিথ্য করে না ব'লে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, আমি ভিখারী, আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারো নেই। কে বলে নেই? আমি তো শুনেছি পশ্চিম-দেশ বারম্বার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছে, "ভারতের বাণী কই?" তা'রপর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে, এ তো সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের

মতো শোনাচ্চে। তাইতো দেখি আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্স্‌ম্যুলরের পাঠশালা থেকে বাহির হ'য়েই আর্য্য-সভ্যতার দম্ভ ক'র্‌তে থাকে, তখন তা'র মধ্যে পশ্চিম গড়ের বাদ্যের কড়ি-মধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তা'র মধ্যে সেই পশ্চিম-রাগেরই তার-সপ্তকের নিখাদ তীব্র হ'য়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব্ব-ভূভাগের হ'য়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তা'র ধন-সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌বে এবং তা'র পরিবর্ত্তে সে বিশ্বের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তা'র আসন প'ড়্‌বে। কিন্তু আমি বলি এই মান-সম্মানের কথা এ-ও বাহিরের, এ-কেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই ব'ল্‌বার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি ক'র্‌তে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ ক'র্‌তে, কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তা'র প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশ-তত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার ক'র্‌তে হবে, কর্ম্মের মধ্যে প্রচলিত ক'র্‌তে হবে, তাহ'লেই সকল মানুষের সম্মান ক'রে আমরা সম্মানিত হবো, নবযুগের উদ্বোধন ক'রে আমরা জরামুক্ত হবো। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই :—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্‌সতে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

য়ুরোপীয় সভ্যতা এক্ষণে বিপুলায়তন ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। য়ুরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া—তিন মহাদেশ এই সভ্যতাকে বহন পোষণ করিতেছে। এত ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক দেশের উপরে এক মহাসভ্যতার প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য্য বৃহদ্ব্যাপার, ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। সুতরাং কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার বিচার করিব? কোন্ ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণাম নির্ণয় করিব? অন্য সকল সভ্যতাই এক দেশের সভ্যতা, এক জাতির সভ্যতা। সেই জাতি যতদিন ইন্ধন যোগাইয়াছে ততদিন তাহা জ্বলিয়াছে, তাহার পরে তাহা নিবিয়া গেছে, অথবা ভস্মাচ্ছন্ন হইয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা-হোমানলের সমিধকাষ্ঠ যোগাইবার ভার লইয়াছে—নানা দেশ নানা জাতি। অতএব এই যজ্ঞ-হুতাশন কি নিবিবে, না, ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে?

কিন্তু এই সভ্যতার মধ্যেও একটি কর্তৃভাব আছে,—কোনো সভ্যতাই আকারপ্রকারহীন হইতে পারে না। ইহার সমস্ত অবয়বকে চালনা করিতেছে এমন একটি বিশেষ শক্তি নিশ্চয়ই আছে। সেই শক্তির অভ্যুদয় ও পরাভবের উপরেই এই সভ্যতার উন্নতি ও ধ্বংস নির্ভর করে। তাহা কী? তাহার বহুবিচিত্র চেষ্টা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্যতন্ত্র কোথায়?

য়ুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, অন্য

সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

ইংলণ্ডে বলো, ফ্রান্সে বলো, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মতবিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ-সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। জাতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মতো হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষা য়ুরোপের সর্ব্বসাধারণের তেমনি একটি অন্তর্নিহিত সংস্কার।

ইতিহাসের কোন্ গূঢ়নিয়মে দেশবিশেষের সভ্যতা ভাববিশেষকে অবলম্বন করে তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, যখন সেই ভাব তাহার অপেক্ষা উচ্চতর ভাবকে হনন করিয়া বসে তখন ধ্বংস অদূরবর্ত্তী হয়।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম্ম আছে, তেম্‌নি জাতিধর্ম্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আছে যাহা মানবসাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যখন সেই উচ্চতর ধর্ম্মকে আঘাত করিল, তখন ধর্ম্ম তাহাকে প্রতিঘাত করিল—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

এক সময় আর্য্যসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ-শূদ্রে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উচ্চতর ধর্ম্মকে পীড়িত করিল। বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু ধর্ম্মকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল না। সে যখন উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বচর্চ্চা হইতে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত করিল তখন ধর্ম্ম তাহার প্রতিশোধ লইল। তখন ব্রাহ্মণ্য আপন জ্ঞানধর্ম্ম লইয়া

পূর্ব্বের মতো আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অজ্ঞান-জড় শূদ্রসম্প্রদায় সমাজকে গুরুভাবে আকৃষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়া রাখিল। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নীচে নামাইল। আজিও ভারতে ব্রাহ্মণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের সংস্কারে, নিকৃষ্ট অধিকারীর অজ্ঞানতায়, ব্রাহ্মণসমাজ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন আবিষ্ট।

ইংরাজের আগমনে যখন জ্ঞানের বন্ধনমুক্তি হইল, যখন সকল মনুষ্যই মনুষ্যত্বলাভের অধিকারী হইল তখনি হিন্দু ধর্ম্মের মূর্চ্ছাপগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আজ ব্রাহ্মণ-শূদ্রে সকলে মিলিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত আদর্শের বিশুদ্ধমূর্ত্তি দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্রেরা আজ জাগিতেছে বলিয়াই ব্রাহ্মণও জাগিবার উপক্রম করিতেছে।

যাহাই হউক আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা নিত্যধর্ম্মকে নানাস্থানে খর্ব্ব করিয়াছিল বলিয়াই তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথে গেল।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে, ধর্ম্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে তাহার পূর্ব্বসূচনা দেখা যাইতেছে।

ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতাও ধর্ম্মকে প্রকাশ্য-ভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'জোর যার মুলুক তার' এ-নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না।

যে ধর্ম্মনীতি ব্যক্তি-বিশেষের নিকট বরণীয় তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জ্জনীয়, এ-কথা এক প্রকার সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইয়া

উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ,সত্যভঙ্গ,প্রবঞ্চনা, এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্য্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্ম্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেই জন্য ফরাসী, ইংরাজ, জর্ম্মান, রুশ, ইঁহারা পরস্পরকে কপট, ভণ্ড, প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে, যে ক্রমশই স্পর্দ্ধিত হইয়া ধ্রুব-ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাস-বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন খ্রীষ্টান মিশনারীদের মুখেও 'ভাই' কথার মধ্যে ভ্রাতৃভাবের সুর লাগে না।

হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।

'নেশন্' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল্ মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন্ গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে-স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল্ কর্ত্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই আমরা য়ুরোপকে ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবে মউজর্ বন্দুক ও দম্‌দম্ বুলেটের সাহায্যে বড়ো হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব, স্বতন্ত্র হইব, আমাদের বিজেতাদের অপেক্ষা ন্যূন হইব না। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে দরখাস্তের দ্বারা যাহা পাইব, তাহার দ্বারা আমরা কিছুতেই বড়ো হইব না।

পনেরো ষোলো শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল নহে। নেশন্‌ই যে সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, সে কথার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চারিত্র আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।

এই ন্যাশনাল্ আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই? আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাগুলির মধ্যে কি নানাপ্রকার মিথ্যা, চাতুরী ও আত্মগোপনের প্রাদুর্ভাব নাই? আমরা কি যথার্থ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে শিখিতেছি? আমরা কি পরস্পর বলাবলি করি না যে, নিজের স্বার্থের জন্য যাহা দূষণীয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য তাহা গর্হিত নহে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেই কি বলে না?—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাৎ ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতো বধীৎ॥

বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, তাহাই বিচার্য্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্ম্মকে পীড়িত করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তবে

তাহার আপাততঃ উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া যেন বরণ না করি।

আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁচে নেশন্ গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।

(১৩০৮)

নববর্ষ *

অধুনা আমাদের কাছে কর্ম্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি। হাতের কাছে হোক্—দূরে হোক্, দিনে হোক্—দিনের অবসানে হোক্, কর্ম্ম করিতে হইবে। কী করি, কী করি,—কোথায় মরিতে হইবে—কোথায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে, ইহাই অশান্তচিত্তে আমরা খুঁজিতেছি। য়ুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা। কাজ, অকাজ, অকারণ কাজ, যে উপায়েই হোক্, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া—মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে। এই কর্ম্ম-নাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন এক-একটা জাতিকে পাইয়া বসে তখন পৃথিবীতে আর শান্তি থাকে না। তখন দুর্গম হিমালয়-শিখরে যে লোমশ-ছাগ এতকাল নিরুদ্বেগে জীবন বহন করিয়া আসিতেছে তাহারা অকস্মাৎ শিকারীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে। বিশ্বস্ত-চিত্ত সীল্ এবং পেঙ্গুয়িন্ পক্ষী এতকাল জনশূন্য তুষার-মরুর মধ্যে নির্ব্বিরোধে প্রাণধারণ করিবার সুখটুকু ভোগ করিয়া আসিতেছিল,—অকলঙ্ক শুভ্র নীহার হঠাৎ সেই নিরীহ প্রাণীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কোথা হইতে বণিকের কামান শিল্প-নিপুণ প্রাচীন চীনের কণ্ঠের মধ্যে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে,—এবং আফ্রিকার নিভৃত অরণ্য-সমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া আর্ত্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।

---

* বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত।

এখানে আশ্রমে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্ম্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্ম্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুখের দিকে যখনি চাই, দেখি, সে অক্লিষ্ট—অক্লান্ত, যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজ-গোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসন-গ্রহণ করিয়াছে। ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলিকে নিয়ে গোপন করিয়া স্থিতিকেই গতির উর্দ্ধে রাখিয়া, প্রকৃতি আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশমান রাখিয়াছে—উর্দ্ধশ্বাস কর্ম্মের বেগে নিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়মান কর্ম্মের স্তূপে নিজেকে আচ্ছন্ন করে নাই।

এই কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে অবকাশ, এই চাঞ্চল্যকে ধ্রুবশান্তি দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখা,—প্রকৃতির চিরনবীনতার ইহাই রহস্য। কেবল নবীনতা নহে, ইহাই তাহার বল।

ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্কধূসর প্রান্তরের নিকট তাহার জলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষ-কৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কর্ম্মের ক্রীতদাস নহে।

সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মকে মাহাত্ম্য দিয়া বস্তুত কর্ম্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্ম্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্ম্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্যমাত্র।

দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষা-চঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে, এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। শান্তির মর্ম্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধার-ভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না—জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজি-স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না,—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ-সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী—তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনো জলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্ব-রচিত যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি; যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম-সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেন-রাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব ঐ অবিচলিত-শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্য্যোগের মধ্যে জলিতেছে; তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্চার মধ্যে কম্পিত হইতেছে;—যখন ঝড়ের গর্জ্জনে অতি-বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ-বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহ-দণ্ডের ঘর্ষণ-ঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন

নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ—তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন—তাহাকে অবিশ্বাস করিব না,—যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস-সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।

*   *   *   *

আমোদ বল, শিক্ষা বল, হিতকর্ম্ম বল, সকলকেই একান্ত জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিলে কর্ম্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর এতই বৃহৎ হইয়া উঠে যে, মানুষ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় কর্ম্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই—তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধ যজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা গোপনে থাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা গোপন নহে—মাঝে মাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপে বড়ো দল ছোটো দলকে পিষিয়া ফেলে, বড়ো টাকা ছোটো টাকাকে উপবাসে ক্ষীণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকার মতো চোখ বুঁজিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।

কাজের উদ্যমকে অপরিমিত বাড়াইয়া তুলিয়া, কাজগুলাকে প্রকাণ্ড করিয়া, কাজে কাজে লড়াই বাধাইয়া দিয়া যে অশান্তি ও অসন্তোষের বিষ উন্মথিত হইয়া উঠে, আপাতত সে আলোচনা থাক্। আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল কৃষ্ণধূম-শ্বসিত দানবীয় কারখানা-গুলার ভিতরে, বাহিরে, চারিদিকে মানুষগুলাকে যে-ভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জ্জনত্বের সহজ অধিকার

একাকিত্বের আব্রুটুকু, থাকে না। না থাকে স্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইরূপে নিজের কাছে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপূর্ব্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে। নীরব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারো থাকে না।

যাহারা শ্রমজীবী, তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী, তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ, খেলা, নৃত্য, ঘোড়-দৌড়, শিকার ও ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুষ্কপত্রের মতো দিনরাত্রি তাহারা নিজেকে আবর্ত্তিত করিয়া বেড়ায়। যদি একমুহূর্ত্তের জন্য তাহার প্রমোদচক্র থামিয়া যায়, তবে সেই ক্ষণকালের জন্য নিজের সহিত সাক্ষাৎকার তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

য়ুরোপের আদর্শ য়ুরোপকে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা আমরা কিছুই জানিনা। তাহা যে স্থায়ী নহে, তাহার মধ্যে যে অনেক বিনাশের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। ভারতবর্ষ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে— য়ুরোপ প্রবৃত্তিকে লালন করিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছে। নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আমাদের আসক্তি ছিল না বলিয়া বিদেশীর নিকট আমরা দেশকে বিসর্জ্জন দিয়াছি,—নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আসক্তি সযত্নে পোষণ করিয়া য়ুরোপ আজ কোন্ রক্ত-সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। অস্ত্রে-শস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া তুলিয়া তাহার এ কী বিকট মূর্ত্তি! কী সন্দেহ ও কী আতঙ্কের সহিত য়ুরোপের প্রত্যেক রাজশক্তি পরস্পরের প্রতি ক্রূর কটাক্ষপাত করিতেছে! রাজমন্ত্রীগণ টিপিয়া টিপিয়া পরস্পরের মৃত্যু-চাল চালিতেছে; রণতরী সকল মৃত্যুবাণে পরিপূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সমস্ত

সমুদ্রে যম-দৌত্যে বাহির হইয়াছে। আফ্রিকায় এশিয়ায় য়ুরোপের ক্ষুধিত লুব্ধকগণ আসিয়া ধীরে ধীরে এক এক পা বাড়াইয়া একটা থাবায় মাটি আক্রমণ করিতেছে এবং আর একটা থাবা সম্মুখের লোলুপ অভ্যাগতের প্রতি উদ্যত করিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার হিংসার আলোতে অদ্য পৃথিবীর চারি মহাদেশ ও দুই মহাসমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপরে আবার মহাজনদের সহিত মজুরদের, বিলাসের সহিত দুর্ভিক্ষের, দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির সহিত সোশ্যালিজম্ ও নাইহিলিজম্-এর দ্বন্দ্ব য়ুরোপের সর্ব্বত্রই আসন্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তির প্রবলতা, প্রভুত্বের মমতা, স্বার্থের উত্তেজনা, কোনোকালেই শান্তি ও পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইতে পারে না, তাহার একটা প্রচণ্ড সংঘাত, একটা ভীষণ রক্তাক্ত পরিণাম আছেই। অতএব য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বিবেচনাপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভারতবর্ষকে মাপিয়া খাটো করিবার প্রয়োজন নাই।

য়ুরোপ বলে, জিগীষার অভাব ও সন্তোষই জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে বটে কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। যে-লোক জাহাজে আছে, তাহার পক্ষে যে-বিধান, যে-লোক ঘরে আছে, তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। য়ুরোপ যদি বলে, সভ্যতামাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল য়ুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের ধন-রত্নকে ভাঙা-কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সঙ্গত হয় না।

বস্তুত সন্তোষের বিকৃতি আছে বলিয়াই অত্যাকাঙ্ক্ষার বিকৃতি নাই, এ কথা কে মানিবে? সন্তোষ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যদি কাজে শৈথিল্য আনে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে অত্যাকাঙ্ক্ষার দম্ বাড়িয়া গেলে যে ভূরি-ভূরি অনাবশ্যক ও নিদারুণ অকাজের সৃষ্টি হইতে থাকে,

এ-কথা কেন ভুলিব ? প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয়টাতে অপঘাতে মৃত্যু হয়।

অতএব সে-আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ, সংযম, শান্তি, এ-সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ।

আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্ম্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড় পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষা-কালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্য্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্ম্মের বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপে যাহাকে "ফ্রীডম্" বলে, সে-মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে-মুক্তি চঞ্চল, দুর্ব্বল, ভীরু; তাহা স্পর্দ্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর;—তাহা পরের প্রতি অন্ধ; তাহা ধর্ম্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে! তাহা কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্ম্মে চর্ম্মে অস্ত্রে শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে—তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্ব-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে—তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় "ফ্রীডম্" কোনোকালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না। এখনো আধুনিক-কালের ধিক্কার সত্ত্বেও এই "ফ্রীডম্" আমাদের সর্ব্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর—বিশালতর যে মহত্ত্ব—যে মুক্তি ভারতবর্ষের

তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি,—অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুকুট পবিত্র হইবে।

অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব—সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে তখনও ঝরিয়া পড়িবে না—তখন সেই অম্লান-গৌরব মাল্যখানি আশীর্ব্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়-চিত্তে সরল হৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে! যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, উদার, যাহা নির্ব্বাক্, তাহারই জয় হইবে,—আমরা—যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

"মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী সমানা।"

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে—"পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন—"ওঁ ইতি ব্রহ্ম!"

তিনি কহিবেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

তিনি কহিবেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

(১৩০৫, ১৩০৯)

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে-ব্যক্তি রথচাইল্ডের জীবনী পড়িয়া গেছে সে খৃষ্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে ; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না, তাহার আবার জীবনী কিসের ? তেম্‌নি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশ-মালা ও জয়-পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারত-বর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্‌স নাই, সেখানে আবার হিস্‌ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে-ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে, সে-ই প্রাজ্ঞ।

যিশুখৃষ্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেম্‌নি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ-কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি,

প্রভেদের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐকান্তিক বিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্র-গৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্র-গৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্র-গৌরব লাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি—এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ-বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধ-মূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলন-মূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল্ ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখা যায়, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারা যায় না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্ব্বদাই জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া—সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ঐক্য-মূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন

ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—ইহাদিগকে একটি মূল-ভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়; আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিয়ু জীলাণ্ড, কেপকলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্য্যন্ত পাইতেছি। হয় পরকে কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া স্ব-বিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্ম্মকেই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ

করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্য-বিস্তার ও শৃঙ্খলা-স্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি; গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

(১৩০৯)

স্বদেশী সমাজ

(বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়)

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্য্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্ম্মরায়মান বেণু-কুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথি-শালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডী-মণ্ডপে রামায়ণ-পাঠ হইতেছে এবং কীর্ত্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রী-ভ্রষ্ট হয় নাই।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে—তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

ইংরেজিতে যাহাকে ষ্টেট্ বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি

আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের ষ্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজ-শক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত দেশের সমস্ত কল্যাণ-কর্ম্মের ভার ষ্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্ত্তব্য ছিল না তাহা নহে। কিন্তু কেবল আংশিকভাবে ;—বস্তুত সাধারণত সে কর্ত্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীঘিকা খনন করিয়া দিতেন না তাহা নহে কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেম্‌নি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণ-ভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্ম্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হইবে। এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্‌স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষাদান, এসমস্ত বিষয়েই বিলাতে ষ্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্ম্ম-ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরাজ ষ্টেট্‌কে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্ম্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই ষ্টেটকে জাগ্রত রাখিতে সচেষ্ট রাখিতে জন-সাধারণ সর্ব্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থা নির্ব্বিচারে গবর্ণমেণ্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালোবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্ম্মভার সাধারণের সর্ব্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভালো, না, তাহা বিশেষভাবে সরকার-নামক একটা জায়গায় নির্দ্দিষ্ট হওয়া ভালো। আমার বক্তব্য এই যে, এ-তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিং ক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ-তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ, এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে—বিলাতরাজ্যের ষ্টেট সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্ন-রূপে প্রতিষ্ঠিত—তাহা সেখান-কার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা লাভ করিতে পারিব না—অত্যন্ত ভালো হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য।

আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন্, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে-কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্ম্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানাজাতির, নানা রাজার অধীনতা-পাশ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো

বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজ-বহির্ভূত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এ-পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচার বিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরাজের আইনে বাঁধিয়া গেছে,—পরিবর্ত্তনমাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্ম্মস্থান—যে মর্ম্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই-আমাদের অন্তরতম মর্ম্মস্থান আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিফলতা আক্রমণ করিতেছে। ইহাই বিপদ, জলকষ্ট বিপদ নহে।

পূর্ব্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়-রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবেরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজ-প্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজ-প্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তি লাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজ-রাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লী তাঁহাদিগকে যে-সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্ম-পল্লীর কুটীর-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকার দত্ত রাজা মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে

পারে নাই। এইজন্য দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্বচর্চ্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি একথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাক্, বিদ্যা ও ধনমান অর্জ্জনের জন্য বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে-আকর্ষণে বাঙালীজাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে—তাহাতে বাঙালীর সমস্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালীর কর্ম্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালীকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উল্‌টা-পাল্‌টা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জ্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

পোলিটিক্যাল্ সাধনার একমাত্র চরম উদ্দেশ্য দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল্ শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরম লাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে

সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে করো প্রোভিন্শ্যাল্ কন্ফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্য্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি-ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী-ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূর-দূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্ত্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক্-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে—তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলাভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লী-বাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত-চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হয়,—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেম্নি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র হয়, তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল

বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই, যেখানে নানাস্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে। প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিতসম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন,—কোনো-প্রকার নিস্ফল পলিটিক্‌সের সংস্রব না রাখিয়া, বিদ্যালয়, পথ-ঘাট, জলাশয় গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারিবেন।

আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশের নানাস্থানে মেলা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হন; তাহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা রচনা করিয়া, সঙ্গে বায়স্কোপ, ম্যাজিক্‌-লণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজ-বাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথা-নিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা-দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্য্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্য-রস ও ধর্ম্ম-শিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশত অধিকাংশ জমিদার সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ আহ্লাদ, সমস্তই কেবল সহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচ-গান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্ম্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না—সে স্থলে "ইতরে জনাঃ" মিষ্টান্নের উপায় জোগাইয়া থাকে, কিন্তু "মিষ্টান্নম্" "ইতরে জনাঃ" কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না—ভোগ করেন "বান্ধবাঃ" এবং "সাহেবাঃ"। ইহাতে বাংলার গ্রাম-সকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে-সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল,—তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীদ্বারে আর একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্য শ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জল-দান স্বাস্থ্য-দান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জল-কষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে, তেম্নি আমাদের দেশে যে সকল মেলা ধর্ম্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ্য এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হইব।

আমাদের দিশী লোকের সঙ্গে দিশী ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ্য

হইতে পারে, আমি তাহারি একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র, এবং এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া, কী করিয়া যে একটা দেশ-ব্যাপী মঙ্গল-ব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে তাহাই আভাস দেওয়া গেল।

যাঁহারা রাজ-দ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তিকে দেশের সর্ব্বপ্রধান মঙ্গল ব্যাপার বলিয়া গণ্য করেন না তাঁহাদিগকে অন্য-পক্ষ "পেসিমিষ্ট্" অর্থাৎ আশা-হীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া যেন আমরা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি।

আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্ম-নির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনো দিনই আমি এরূপ দুর্লভ-দ্রাক্ষাগুচ্ছ-লুব্ধ হতভাগা শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদ-ভিক্ষাই যথার্থ "পেসিমিষ্ট্" আশা-হীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনোমতেই বলিব না, আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্ম-শক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে-উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে-সার্থকতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্ত্তন-শীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা পুনঃপুনঃই ব্যর্থ হইতে থাকে, অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কী, আমাদিগকে চারিদিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ-স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। আমরা যে-কোনো মানুষের সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এই জন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্য্যসাধনার কল বা কলের

অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালো-মন্দ দুই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি তদপেক্ষাও বড়ো, ইহা প্রাচ্য।

প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে পারি। ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধুর্য্যটুকু ভুলিতে পারে না। এই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে। আমরা এই দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে-পরে, উচ্চে-নীচে গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ-দেশে টোল, পাঠশালা, জলাশয়, অতিথি-শালা, দেবালয়, অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্ন-দান, জল-দান, আশ্রয়-দান, স্বাস্থ্য-দান বিদ্যা-দান, প্রভৃতি সামাজিক কর্ত্তব্য ছিন্ন-সমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃ-পুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশু-পক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গল-সম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণ ভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব? প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়সা বা তদপেক্ষা অল্প—একমুষ্টি বা অর্দ্ধমুষ্টি তণ্ডুলও

স্বদেশ-বলি-স্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? স্বদেশের সহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ—সে কি আমাদের ব্যক্তিগত হইবে না? আমরা কি স্বদেশকে জল-দান বিদ্যা-দান প্রভৃতি মঙ্গলকর্ম্মগুলিকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা, চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব? গবর্মেণ্ট আজ বাংলা-দেশের জল-কষ্ট নিবারণের জন্য পঞ্চাশ-হাজার টাকা দিতেছেন—মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশ-লক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না—তাহার ফল কী হইল? তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তা-লাভ কল্যাণ-লাভের সূত্রে দেশের যে-হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকার পাইবে, সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশীর দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি—কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যত-কিছু কল্যাণ সম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেণ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশ-গামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে? এইজন্যই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে-বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই কি বলে দেশহিতৈষিতা? ইহা কদাচই হইতে পারে না। ইহা কখনই চিরদিন এদেশে প্রশ্রয় পাইবে না—কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম নহে। বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্ত্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে—কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং

প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম্ম। এইবার সময় আসিয়াছে,—যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে,—যখন প্রত্যেকে জানিব আমি একক নহি,—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

* * * * *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্প-পরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্ম উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভ কর্ম্মে গ্রাম-ভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী-সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত, দানে বড়ো বড়ো মঠ মন্দির চলিতেছে এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে-জলে স্বাস্থ্য-বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্য-লাভ করিবে তখন কৃতজ্ঞতা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

আত্ম-শক্তি একটি বিশেষ-স্থানে সর্ব্বদা সঞ্চয় করা, সেই বিশেষ-স্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষ-স্থান হইতে প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতি ও শান্তি-স্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব-স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্ত্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজ বারে বারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেই।

নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করিবেন না, আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন—সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন—ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে; তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাস-স্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনি এই মুহূর্ত্তেই ধীরে ধীরে নূতনকালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞান-ভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি—জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি!

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আর্য্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্য্যগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্য্যেরা আদিম অষ্ট্রেলিয়ার বা আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্য্য-উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা আমাদের আচার বিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্বেও একটি সমাজ-তন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া আর্য্য-সমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর একবার সুদীর্ঘকাল বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ প্রভাবের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পর-দেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই মিলনের সংস্রব আরো গুরুতর! বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে—মিলনের অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধ-ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল; সেই এশিয়া-ব্যাপী ধর্ম্ম-প্লাবনের সময় নানাজাতির আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-কর্ম্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থা-স্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল। পূর্ব্বাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্ব্বত্রই সে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে।

ইহার পরেই এই ভারতবর্ষে মুসলমানের সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজে এই পর-সংঘাতের সহিত সামঞ্জস্য-সাধনের প্রক্রিয়া সর্ব্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান-সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগ-স্থল সৃষ্ট হইতেছিল, যেখানে উভয় সমাজের সীমা-রেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানক-পন্থী, কবীর-পন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব-সমাজ ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানাস্থানে ধর্ম্ম ও আচার লইয়া যে সকল ভাঙা-গড়া চলিতেছে, শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্য-সাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।

সম্প্রতি আর এক প্রবল বিদেশী আর এক ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান,—তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কারখানা-ঘর খুলিয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবের সময় সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্য্যস্ততা ঘটিয়াছিল

তাহাতে পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ-পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজ, আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটে-ঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পর-সংশ্রব হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎপদ হারাইতে হইয়াছে! এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্ম্মে বিজ্ঞানে দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত সকলদিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে;—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্র-যাত্রা আমরা সকল দিক দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র! আমরা ছিলাম বিশ্বের—দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীরু স্ত্রী-শক্তি আছে, সেই শক্তিই, কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষ-শক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্ত্রৈণ-প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ আর বাড়িতেছে না, তাহা খোওয়া-ই যাইতেছে!

জ্ঞানের অধিকার, ধর্ম্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচার পালনমাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল—তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল, তাহাকেও অকর্ম্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্ব-মানবের অঙ্গ। বিশ্ব-মানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা-লাভ করে। যখন যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সেই বিরাট মানবের কলেবরে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় সে কেবল ভার-স্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুত কেবল টিকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বার-বাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিত-চিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্ব্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্ম্ম-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে-গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে-গৌরব রাজচক্রবর্ত্তিত্বের চেয়ে বড়ো।

সে গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁটলি পাঁটলা লইয়া ভীত চিত্তে কোণে বসিয়া আছি এমন সময়েই ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেকস্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেম্‌নি হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য! এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিষ আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কী আশ্চর্য্য শক্তি ছিল তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কী আশ্চর্য্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা ও চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। কোণে বসিয়া কেবল "গেল" "গেল" বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ হইয়াও আমরা ইংরাজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা, তাহাই সজ্ঞান-ভাবে, সবল-ভাবে, সচল-ভাবে, সম্পূর্ণ-ভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে। কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের তাপসেরা তপস্থার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে, স্ব-স্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী

কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। এই সামঞ্জস্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হৌক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে,—লজ্জা দূর হইবে,—ভারতবর্ষের মধ্যে যে-একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে, তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব, তাহা নহে,—ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন—তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে,—ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলকেই স্ব স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদ-নিরত ব্যবধান-সঙ্কুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্ব্বে—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' যে মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চির-সঞ্চিত জ্ঞান-ধর্ম্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথ-রাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—দেশের মধ্যস্থলে সন্তান-পরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো! আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ

করিতে জানিত,—একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্ম্মকে অপমানিত করিব ? আজ আবার আমরা সেই শুচি-শুদ্ধ, সেই মিত-সংযম, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না ? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে ?—কথনই নহে ! নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে, নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিতেছে। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে ;—এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈঃ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আর যেথানে পথটি আমাদের মঙ্গল-দীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইথানে আমাদের গৃহযাত্রা-রম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্ !"

(১৩১১)

সমস্যা

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যা যে কী, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতী নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতীবস্ত্র হরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেম্‌নি করিয়াছি অম্‌নি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতরো আর কথনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হউক কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিত-রূপেই জানা আবশ্যক ছিল, আজও আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে-কাজ করিতেই যাই না কেন এই বাস্তবটি আমাদিগকে কথনই বিস্মৃত হইবে না। একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচবর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে অতএব কোনোমতে মিলন-সাধন করিয়া আমরা বল লাভ করিব, এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো কথা নয়; সুতরাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।

কেবলমাত্র প্রয়োজন-সাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি; নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। যিশু বলিয়া গিয়াছেন মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবন-ধারণ করে না; তাহার কারণ, মানুষের কেবল শারীর জীবন নহে।

এই যে বৃহৎ-জীবনের খাদ্যাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতেই ইংরেজ শাসন হইতেই ঘটিত, তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কার্য্য সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে, কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিকে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে, আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি সমস্ত হিত-চেষ্টা, পরিবার ও বংশের মধ্যে, এবং এক-একটি সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কার্য্য-সিদ্ধির উপায় বলিয়াই গৌরবের নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মনুষ্যত্ব অর্থাৎ তাহার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতে সে যে-পরিমাণেই বঞ্চিত হয়, সেই পরিমাণেই সে শুষ্ক হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে আমরা এই শুষ্কতাকে

প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম, আচার ব্যবহারের, আমাদের সর্ব্বপ্রকার আদান-প্রদানের বড়ো বড়ো রাজপথ এক একটা ছোটো ছোটো মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে. আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর ও নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা বিশ্ব-মানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আরাম পাইয়াছি, ক্ষুদ্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে আমরা অনেক দিন হইতে বঞ্চিত হইয়া দীন-হীনের মতো বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিবার উপায় আমরা নিজের মধ্য হইতেই যদি বাঁধিয়া তুলিতে না-পারি, তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া? ইংরেজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিদ্র পূরণ হইবে, আমরা এ কল্পনা কেন করিতেছি? আমরা যে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি নাই, সহায়তা করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেষ্টা করি নাই, আমরা যে এতকাল "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ" করিয়া বসিয়া আছি;—পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই ঔদাসীন্য, অবজ্ঞা, সেই বিরোধ আমাদিগকে যে একান্তই ঘুচাইতে হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতী কাপড় ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের শক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে? এ নহিলে আমাদের ধর্ম্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইতেছে; এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না—আমাদের দুর্ব্বল চিত্ত শত শত অন্ধ সংস্কারের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকিবে—আমরা আমাদের অন্তর-বাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বিশ্ব-সমাজের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বাধ বিপুল মনুষ্যত্বের

অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনোমতেই বড়ো হইতে পারে না, কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে কেহ আছে, যে-কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব—ভারতবর্ষে বিশ্ব-মানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্ম্মে বিচিত্র—নর-দেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্ব্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা; মানবের প্রতি সর্ব্বসহিষ্ণু পরম প্রেমের দ্বারা; উচ্চ-নীচ, আত্মীয়-পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে, শুভচেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও—যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত করো। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করো, বারম্বার আঘাত করো—কোনো নৈরাশ্য, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের নিকট যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব আছে তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে; অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহু-

দিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য ও বজ্রের গর্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে,—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্ব্ব-পশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারিদিকে ধারাবর্ষণ হইয়া তৃষিতের পাত্রে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিবে। মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে, এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য? ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার জন্য, বীজ বুনিবার জন্য—তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য।

(১৩১৪)

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস ?

একদিন যে শ্বেতকায় আর্য্যগণ প্রকৃতির এবং মানুষের সমস্ত দুরূহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে অন্ধকারময় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল, তাহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মতো সরাইয়া দিয়া ফলশস্যে বিচিত্র, আলোকময়, উন্মুক্ত রঙ্গভূমি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি শক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তিরচনা করিয়াছিল। কিন্তু একথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্য্যরা অনার্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আর্য্য-দের ক্ষমতা যখন অক্ষুণ্ণ ছিল, তখনো অনার্য্য শূদ্রদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিয়াছে। তারপর বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আরো অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনার বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশের অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম্ম পালন করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে রাজাজ্ঞায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইল একথা প্রসিদ্ধ। বর্ণের যে-

শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্য্যরা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে-শুভ্রতা মলিন হইয়াছে ; এবং আর্য্যগণ শূদ্রদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম্ম দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে ; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্ব্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে ? বিধাতা কি তাহাকে একথা বলিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস ? হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এদেশে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এদেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস্, আর নয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিন্দু মুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে যে বিশ্বকর্ম্মা মানব-সমাজকে সঙ্কীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন তিনি কি তাঁহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহঙ্কারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন ?

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি আর কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সবচেয়ে বড়ো করিয়া আলোচিত হইতেছে তাহা নহে। তাঁহার আদালতে নানা পক্ষের উকীল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে, অবশেষে এক-দিন মকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু, নয় মুসলমান, নয় ইংরেজ,

নয় আর কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান গাড়িয়া বসিবে একথা সত্য নহে। আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহঙ্কার; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে,—আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকে আমরা যে-পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে; নিজেকে ব্যক্তি হিসাবেই হউক্ আর জাতি হিসাবেই হউক্ জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা আলেকজাণ্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই তাহাতে গ্রীসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে—পৃথিবীতে আজ সে দম্ভের মূল্য কী? রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের আয়োজন বর্ব্বরের সংঘাতে ফাটিয়া খান্ খান্ হইয়া সমস্ত য়ুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল তাহাতে রোমকের অহঙ্কার অসম্পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে? গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্য্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে;—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা

গঠনে হিন্দু, মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্ত্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমার স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে খণ্ড সামগ্রী কোনোমতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। ভারতবর্ষেরও যে-অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য সকলের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে,হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জ্জন করিবেন। কারণ, ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত ; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি তবে আমরাই নষ্ট হইব। আমরা সর্ব্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর কেহ পদার্পণ করিবে না, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহ-পেটকে আবদ্ধ থাকিবে তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে, বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের

আদেশ হইয়া আছে, এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে ; আমরা যাহা করিতে পারি তাহা আমাদের পূর্ব্বেই করা হইয়া গিয়াছে, একথা যদি সত্য হয় তবে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের নানা পরিবর্দ্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্ত্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে, আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে-পর্য্যন্ত না সফল হইবে, জগৎ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্য্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব সে-পর্য্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংরেজের আহ্বান যে-পর্য্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে-পর্য্যন্ত না সার্থক হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে

বলপূর্ব্বক বিদায় করিব এমন শক্তি আমাদের নাই। যে-ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে? বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে? এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ? সেই আমরা কাহারা? সে কি বাঙালী, না মারাঠি,না পাঞ্জাবী, হিন্দু না মুসলমান? একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—এই অখণ্ড প্রকাণ্ড "আমরার" মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক্, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরও যে-কেহ আসিয়াই এক হউক না—তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহা-ভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বকে মিলাইয়া লইবার এই কাজেই জীবন-যাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্ব্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার,

সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন ;—আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর ; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সঙ্কুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন ; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্য্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কারবশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই ; যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।

পশ্চিম ভারতে রাণাডে পূর্ব্ব পশ্চিমের সেতু বন্ধনকার্য্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি, সেই মিলনতত্ত্ব, রাণাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল ; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহার-বিরোধ ও স্বার্থ-সংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত ইতিহাসের যে-উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতা সাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্ব্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমের ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব্বপশ্চিমের মিলন-যজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে তাহার কারণ এ-সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনার করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা-সাহিত্যে পূর্ব্ব পশ্চিমের আদান প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলন-তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল্ বল লাভ করা। এমন কারয়া যে জিনিষটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে

আমরা সকল মানুষে মিলিব ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্ব্বত্রই বাধা পাইতেছে; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম্মনষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে এই মিলন চেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি তো কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধির অনুগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষিত এমন কি অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে-বিরোধ জন্মিয়াছে তাহাকে আমরা কী ভাবে গ্রহণ করিব? তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই? কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র? ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানাজাতি ও নানাশক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে, বর্ত্তমান বিরোধের আবর্ত্ত কি একেবারেই তাহার প্রতিকূল? তাহা নহে, বিরোধের যথার্থ তাৎপর্য্য কী তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বে বিরোধকেও মিলন সাধনার একটা অঙ্গ বলা হয়। লোক-প্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না। এই জন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম ; আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল ; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বলো আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বলো, তাহা উপার্জ্জনের অপেক্ষা রাখে—অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে—কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না—যে-ভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয় সে-ভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এইজন্যই কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্ব্বিচারে নির্ব্বিরোধে দুর্ব্বলভাবে দীনভাবে যাহা পাইয়াছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া তাহার মূল বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিষ পোষাকী জিনিষ হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্বর্ত্তনের তাড়না আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই ; তাঁহার আপনার দিকে দুর্ব্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন ; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল ; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

যে শক্তি নব্য-ভারতের আদি অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেষ্টা পর্য্যায়-ক্রমে বিপরীত সীমার চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে ইংরেজ-ভারতবাসীর যে বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব;—ইংরেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কারণ শুধু এই একটিমাত্র নহে। ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাহাকে কোনোমতেই ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে পারিব না, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লইবার আত্ম-শক্তির যদি অভাব ঘটে তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়-বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করিবে। আবার অন্যপক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে; ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানতঃ আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসন-তন্ত্র-চালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি; যে-ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে-ক্ষেত্রে যদি

তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক্ হইয়া থাকি তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। একদা ডেভিড্ হেয়ারের মতো মহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজ-চরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন—তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজ-জাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। পূর্ব্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না; তাহারা গ্রাস করে, তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্‌স্‌পীয়র, বায়রণের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বলো, ম্যাজিষ্ট্রেট বলো, সদাগর বলো, পুলিসের কর্ত্তা বলো, সকল প্রকার সম্পর্কেই ইংরেজ তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভিব্যক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না—সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ-আগমনের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে। সুশাসন এবং ভালো আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লাভ তাহা নহে। আফিস আদালত আইন এবং শাসন তো মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়—তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজি আছে। মানুষের পরিবর্ত্তে আইন, রুটির পরিবর্ত্তে পাথরেরই মতো। সে পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্যক্ বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যত কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং

একদিন না একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দ্দম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেই জন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে এ-সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে এবং তাহার যাহা কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেজন্যও আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবে তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, যাহার আছে তাহাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। আমরা রিক্তহস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বার বার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড়ো এবং সকলের চেয়ে ভালো তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে,তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয় তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোনো সহজ পন্থা নাই। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎলাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শক্তির আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরীর লোভে হাত

জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায় তাহারা ইংরেজের পাপ-প্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা যদি সত্য হয় তবে সেজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারিদিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশান্তভাবে কাজ করে; এম্‌নি করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যতদূর পর্য্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজ-সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

কিন্তু যে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেই ভারতবর্ষের সমাজ নিজের দুর্গতি দুর্ব্বলতা বশতই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সেইজন্য যথার্থ ইংরেজ এদেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে ফল পাইত সে ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেই জন্যই পশ্চিমের বণিক,সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড়ো সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্ব্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এদেশে যাহা-কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা-কিছু দুঃখ অপমান। এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না এমন কি প্রকাশ বিকৃত হইয়া

যাইতেছে, সেজন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না; কোনো মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না! ত্যাগের দ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্য-প্রয়োগ করিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতি সাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরাজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরাজকে আপোশ করিয়া চলিতে হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল-পক্ষ দুর্ব্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিতে পারিব না; ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে

আমরা সত্যভাবে উদ্বোধিত করিতে পারিব না এবং ভারতবর্ষ কেবলি বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে।

ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্ম্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকে সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছে না, এই জন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এই জন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না; সে-মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগসাধন হইবে, তখন বর্ত্তমানে ভারত ইতিহাসের যে পর্ব্বটা চলিতেছে সেটা শেষ হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।

(১৩১৫)

৩। সমালোচনা

মেঘদূত

রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা-ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। সেই যেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল, এবং বর্ষার প্রাক্কালে গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক্ পাখীরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং গ্রামের প্রান্তে জম্বুবনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল! সেই যে-অবন্তীতে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন এবং বাসবদত্তার গল্প বলিত, তাহারাই বা কোথায়! আর সেই সিপ্রা-তট-বর্তিনী উজ্জয়িনী! অবশ্য তাহার বিপুলা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত নহে—আমরা কেবল সেই যে হর্ম্ম্য-বাতায়ন হইতে পুর-বধূদিগের কেশ-সংস্কার-ধূপ উড়িয়া আসিতেছিল, তাহারই একটু গন্ধ পাইতেছি, এবং অন্ধকার রাত্রে যখন ভবন-শিখরের উপর পারাবতগুলি ঘুমাইয়া থাকিত, তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং প্রকাণ্ড সুষুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি, এবং সেই রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ রাজধানীর নির্জ্জন পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুলচরণ-ক্ষেপে যে-অভিসারিণী চলিয়াছে তাহারই একটুখানি ছায়ার মতো দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে,—তাহার পায়ের কাছে নিকষে কনক-রেখার মতো যদি অমনি একটুখানি আলো করিতে পারা যায়!

সেই প্রাচীন ভারত খণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাস, দেবগিরি, রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী। মনে হয়, ঐ রেবা, সিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলী হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।

অতএব, যক্ষের যে-মেঘ নগ-নদী-নগরীর উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, পাঠকের বিরহ-কাতরতার দীর্ঘনিশ্বাস তাহার সহচর হইয়াছে। সেই কবির ভারতবর্ষ, যেখানকার জনপদ-বধূদিগের প্রীতিস্নিগ্ধলোচন ভ্রূবিকার শিখে নাই, এবং পুরবধূদিগের ভ্রূলতাবিভ্রমে পরিচিত নিবিড়পক্ষ্ম কৃষ্ণনেত্র হইতে কৌতূহলদৃষ্টি মধুকরশ্রেণীর মতো ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেখান হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি, এখন কবির মেঘ ছাড়া সেখানে আর কাহাকেও দূত পাঠাইতে পারি না।

মনে পড়িতেছে, কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্র-বেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ত্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগরচত্বরে যে-বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে-পথিক-

প্রবাসীরা নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য বিরহ-ব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল অমর সৌন্দর্য্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে; আমরা আমাদের বিরহ-বিচ্ছিন্ন এই বর্ত্তমান মর্ত্ত্যলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি।

কিন্তু কেবল অতীত বর্ত্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল-স্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে! অনন্তের কেন্দ্রবর্ত্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে! আজ কেবল ভাষায়-ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে ভুল-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে মনে জন্ম-মৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র। যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে, তবে সেই আমার বহুভাগ্য, তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমানাং
যে তৎক্ষীরশ্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥

এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—

দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভরিয়া।

আমরা প্রত্যেক নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর-

মুখে চাহিয়া আছি—মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ, এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা-সিপ্রা অবন্তী-উজ্জয়িনী, সুখ সৌন্দর্য্য ভোগ-ঐশ্বর্য্যের চিত্রলেখা ; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না, আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর !

কিন্তু একথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমায় "হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির !" এ কী হইল ! যে আমার মনোরাজ্যের লোক, সে আজ বাহিরে আসিল কেন ! ওখানে তো তোমার স্থান নয় ! বলরাম দাস বলিতেছেন "তেঁই বলরামের পহু চিত নহে স্থির !" যাহারা একটি সর্ব্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়াছিল, তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না—বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।

হে নির্জ্জন-গিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যলোকে শরৎপূর্ণিমা-রাত্রে তাহার সহিত চির-মিলন হইবে ! তোমার তো চেতন অচেতনে পার্থক্য জ্ঞান নাই, কী জানি, যদি সত্য ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাকো !

(১২৯৮)

শকুন্তলা

শেক্‌স্‌পীয়রের টেম্পেষ্ট-নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

নির্জ্জন-লালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দ্দিনান্দের প্রণয় তাপস কুমারী শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয়ের অনুরূপ। ঘটনাস্থলটিরও সাদৃশ্য আছে; এক পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, অপর পক্ষে তপোবন।

এইরূপে উভয়ের আখ্যানমূলে ঐক্য দেখিতে পাই, কিন্তু কাব্যরসের স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি।

য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্ত্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে একমুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

অনেকেই এই কথাটি কবির উচ্ছ্বাসমাত্র মনে করিয়া লঘুভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটামুটি মনে করেন, ইহার অর্থ এই যে, গেটের মতে শকুন্তলা-কাব্যখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা নহে। গেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার

মধ্যে একটি গম্ভীর পরিণতির ভাব আছে ; সে পরিণতি, ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্ম্মে পরিণতি। মেঘদূতে যেমন পূর্ব্ব-মেঘ ও উত্তর-মেঘ আছে—পূর্ব্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য্যে পর্য্যটন করিয়া উত্তর-মেঘে অলকাপুরীর নিত্য-সৌন্দর্য্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্ব্ব-মিলন ও একটি উত্তর-মিলন আছে। প্রথম-অঙ্কবর্ত্তী সেই মর্ত্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্য্যময় বিচিত্র পূর্ব্ব-মিলন হইতে, স্বর্গতপোবনে শাশ্বত-আনন্দময় উত্তর-মিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এই যে মিলন, কালিদাস ইহা অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফুলকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্ত্ত্যের সীমাকে তিনি এমন করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন, যে মাঝে কোনো ব্যবধান কাহারো চোখে পড়ে না। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার পতনের মধ্যে কবি মর্ত্ত্যের মাটি কিছুই গোপন রাখেন নাই ; তাহার মধ্যে বাসনার প্রভাব যে কতদূর বিদ্যমান, তাহা দুষ্যন্ত শকুন্তলা উভয়ের ব্যবহারেই কবি সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। যৌবন-মত্ততার হাব-ভাব লীলা-চাঞ্চল্য, পরম লজ্জার সহিত প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম, সমস্তই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শকুন্তলার সরলতার নিদর্শন। অনুকূল অবসরে এই ভাবাবেশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। সে আপনাকে দমন করিবার, গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই। যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না, তাহার কি বিদ্ধ হইতে বিলম্ব লাগে ? শকুন্তলা পঞ্চশরকে ঠিক-মতো চিনিত না, এই জন্যই তাহার মর্ম্মস্থান অরক্ষিত ছিল। সে না কন্দর্পকে, না দুষ্যন্তকে, কাহাকেও অবিশ্বাস করে নাই।

শকুন্তলার পরাভব যেমন অতি সহজে চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি সেই পরাভব সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা, তাহার

স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ সতীত্ব অতি অনায়াসেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাও তাহার সরলতার নিদর্শন। ঘরের ভিতরে যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায়, তাহার ধূলা প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না, কিন্তু অরণ্যফুলের ধূলা ঝাড়িবার জন্য লোক রাখিতে হয় না—সে অনাদৃত থাকে, তাহার গায়ে ধূলাও লাগে, তবু সে কেমন করিয়া সহজে আপনার সুন্দর নির্মলতাটুকু রক্ষা করিয়া চলে! শকুন্তলাকেও ধূলা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে নিজেও জানিতে পারে নাই—সে অরণ্যের সরলা মৃগীর মতো, নির্ঝরের জলধারার মতো মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।

কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন নাই। আবার অন্যদিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্ম্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একদিকে তরু-লতা ফলপুষ্পের ন্যায় সে আত্মবিস্মৃত স্বভাবধর্ম্মের অনুগতা, আবার অন্যদিকে তাহার অন্তরতম নারীপ্রকৃতি সংযত, সহিষ্ণু, সে একাগ্রতপঃপরায়ণা, কল্যাণ-ধর্ম্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। কালিদাস অপরূপ কৌশলে তাঁহার নায়িকাকে লীলা ও ধৈর্য্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহনার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পিতা ঋষি, তাহার মাতা অপ্সরা, ব্রতভঙ্গে তাহার জন্ম, তপোবনে তাহার পালন। তপোবন স্থানটি এমন, যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য্য এবং সংযম একত্র মিলিত হইয়াছে। সেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান নাই, অথচ ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম বিরাজমান। গান্ধর্ব্ববিবাহ ব্যাপারটিও তেম্‌নি; তাহাতে স্বভাবের উদ্দামতাও আছে, অথচ বিবাহের সামাজিক বন্ধনও আছে। বন্ধন ও অবন্ধনের সঙ্গমস্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা-নাটকটি একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার সুখ দুঃখ মিলন-বিচ্ছেদ

সমস্তই এই উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে। গেটে যে কেন তাঁহার সমালোচনায় শকুন্তলার মধ্যে দুই বিসদৃশের একত্র সমাবেশ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই বুঝা যায়।

টেম্পেষ্টে এ ভাবটি নাই। কেনই বা থাকিবে? শকুন্তলাও সুন্দরী মিরান্দাও সুন্দরী, তাই বলিয়া উভয়ের নাসা চক্ষুর অবিকল সাদৃশ্য কে প্রত্যাশা করিতে পারে? উভয়ের মধ্যে অবস্থার, ঘটনার, প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভেদ। মিরান্দা যে নির্জ্জনতায় শিশুকাল হইতে পালিত, শকুন্তলার সে নির্জ্জনতা ছিল না। মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্য্যে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই। শকুন্তলা সমানবয়সী সখীদের সহিত বর্দ্ধিত,—তাহারা পরস্পরের উত্তাপে, অনুকরণে, ভাবের আদান-প্রদানে হাস্যে-পরিহাসে কথোপকথনে স্বাভাবিক বিকাশ-লাভ করিতেছিল। শকুন্তলা যদি অহরহ কণ্বমুনির সঙ্গেই থাকিত, তবে তাহার উন্মেষ বাধা পাইত, তবে তাহার সরলতা অজ্ঞতার নামান্তর হইয়া তাহাকে স্ত্রী-ঋষ্য-শৃঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিত। বস্তুত শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত। উভয়ের মধ্যে অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাহাতে এইরূপ সঙ্গত। মিরান্দার ন্যায় শকুন্তলার সরলতা অজ্ঞানের দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিরক্ষিত নহে। শকুন্তলার যৌবন সদ্য বিকশিত হইয়াছে এবং কৌতুকশীলা সখীরা সে-সম্বন্ধে যে তাহাকে আত্মবিস্মৃত থাকিতে দেয় নাই, তাহা আমরা প্রথম অঙ্কেই দেখিতে পাই। সে লজ্জা করিতেও শিখিয়াছে। কিন্তু এ সকলই বাহিরের জিনিষ। তাহার সরলতা গভীরতর, তাহার পবিত্রতা অন্তরতর। বাহিরের কোনো অভিজ্ঞতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই,—কবি তাহা শেষ পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন। শকুন্তলার সরলতা আভ্যন্তরিক। সে যে সংসারের কিছুই জানে না তাহা নহে; কারণ তপোবন সমাজের

একেবারে বহির্বর্ত্তী নহে, তপোবনেও গৃহধর্ম্ম পালিত হইত। বাহিরের সম্বন্ধে শকুন্তলা অনভিজ্ঞ বটে, তবু অজ্ঞ নহে; কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের সিংহাসন। সেই বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাহাকে ক্ষণ-কালের জন্য পতিত করিয়াছে কিন্তু চিরকালের জন্য উদ্ধার করিয়াছে; দারুণতম বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতেও তাহাকে ধৈর্য্যে, ক্ষমায়, কল্যাণে স্থির রাখিয়াছে। মিরান্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, সংসার-জ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই;—আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন।

এমনস্থলে তুলনায় সমালোচনা বৃথা। আমরাও তাহা স্বীকার করি। এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া উঠে। সেই বৈসাদৃশ্যের আলোচনাতেও দুই নাটককে পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার সহায়তা করিতে পারে। আমরা সেই আশায় এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

মিরান্দাকে আমরা তরঙ্গঘাত-মুখর শৈল-বন্ধুর জনহীন দ্বীপের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সেই দ্বীপ-প্রকৃতির সঙ্গে তাহার কোনো ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার সেই আশৈশব-ধাত্রীভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলে তাহার কোনো জায়গায় টান পড়িবে না। সেখানে মিরান্দা মানুষের সঙ্গ পায় নাই, এই অভাবটুকুই কেবল তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানকার সমুদ্র-পর্ব্বতের সহিত তাহার অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না। নির্জ্জন দ্বীপকে আমরা ঘটনাচ্ছলে কবির বর্ণনায় দেখি মাত্র কিন্তু মিরান্দার ভিতর দিয়া দেখি না। এই দ্বীপটি কেবল কাব্যের আখ্যানের পক্ষেই আবশ্যক, চরিত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।

শকুন্তলা সম্বন্ধে সে-কথা বলা যায় না। শকুন্তলা তপোবনের

অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায় তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়। শকুন্তলা মিরান্দার মতো স্বতন্ত্র নহে, শকুন্তলা তাহার চতুর্দ্দিকের সহিত একাত্ম-ভাবে বিজড়িত। তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবী-লতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশুপক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট। কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন। সেই-জন্য বলিতেছিলাম, শকুন্তলাকে তাহার কাব্যগত পরিবেষ্টন হইতে বাহির করিয়া আনা কঠিন।

ফার্দ্দিনান্দের সহিত প্রণয়ব্যাপারেই মিরান্দার প্রধান পরিচয়; আর ঝড়ের সময় ভগ্নতরি হতভাগ্যদের জন্য ব্যাকুলতায় তাহার ব্যথিত হৃদয়ের করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলার পরিচয় আরো অনেক ব্যাপক। দুষ্যন্ত না দেখা দিলেও তাহার মাধুর্য্য বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিত। তাহার হৃদয়লতিকা চেতন-অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে। সে তপোবনের তরুগুলিকে জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদরস্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছে। সে নবকুসুম-যৌবনা বন-জ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আপনার কোমলহৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতি-গৃহে যাইতেছে, তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্ম্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে, তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়।

টেম্পেষ্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে।

মানুষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ। সে স্বাধীন হইতে চায়, কিন্তু মানবশক্তিদ্বারা পীড়িত—আবদ্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ করিতেছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ নাই, চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারীহৃদয়ও তাহার প্রতি স্নেহ বিস্তার করে নাই। দ্বীপ হইতে যাত্রা কালে প্রস্পেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায়সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেষ্টে পীড়ন, শাসন, দমন—শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি, সদ্ভাব। টেম্পেষ্টে প্রকৃতি মানুষের আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই—শকুন্তলায় গাছপালা-পশুপক্ষী আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে।

শকুন্তলার আরম্ভেই যখন ধনুর্ব্বাণধারী রাজার প্রতি এই করুণ নিষেধ উত্থিত হইল—"ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোহয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ", তখন কাব্যের একটি মূল সুর বাজিয়া উঠিল। এই নিষেধটি আশ্রম-মৃগের সঙ্গে সঙ্গে তাপসকুমারী শকুন্তলাকেও করুণাচ্ছাদনে আবৃত করিতেছে। ঋষি বলিতেছেন :—

মৃদু এ-মৃগদেহে
মেরো না শর !
আগুন দেবে কে হে
ফুলের পর ?
কোথা হে মহারাজ
মৃগের প্রাণ,
কোথায় যেন বাজ
তোমার বাণ !

এ-কথা শকুন্তলাসম্বন্ধেও খাটে। শকুন্তলার প্রতিও রাজার প্রণয়-শরনিক্ষেপ নিদারুণ। প্রণয়ব্যবসায়ে রাজা পরিপক্ব ও কঠিন—কত কঠিন

অন্যত্র তাহার পরিচয় আছে—আর এই আশ্রমপালিতা বালিকার অনভিজ্ঞতা ও সরলতা বড়োই সুকুমার ও সকরুণ। হায়, মৃগটি যেমন কাতরবাক্যে রক্ষণীয়, শকুন্তলাও তেম্‌নি! "দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ!"

মৃগের প্রতি এই করুণবাক্যের প্রতিধ্বনি মিলাইতেই দেখি, বল্কল-বসনা ও তাপসকন্যা সখীদের সহিত আলবালে জলপূরণে নিযুক্ত, তরু-সোদর ও লতা-ভগিনীদের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক স্নেহসেবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত। কেবল বল্কলবসন নহে, ভাবে ভঙ্গীতেও শকুন্তলা যেন তরু-লতার মধ্যেই একটি। তাই দুষ্যন্ত বলিয়াছেন—

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয়-লোভনীয় কুসুম হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন!

নাটকের আরম্ভেই শান্তিসৌন্দর্য্য-সংবলিত এমন একটি সম্পূর্ণ জীবন, নিভৃত পুষ্পপল্লবের মাঝখানে প্রাত্যহিক আশ্রমধর্ম্ম, অতিথি-সেবা, সখীস্নেহ ও বিশ্ববাৎসল্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল! তাহা এমনি অখণ্ড এমনি আনন্দকর যে, আমাদের কেবলি আশঙ্কা হয়, পাছে আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙিয়া যায়! দুষ্যন্তকে দুই উদ্যত বাহু দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বাণ মারিয়ো না, মারিয়ো না!—এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যটি ভাঙিয়ো না!

যখন দেখিতে দেখিতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছে, তখন প্রথম অঙ্কের শেষে নেপথ্যে অকস্মাৎ আর্ত্তরব উঠিল—"ভো ভো তপস্বীগণ, তোমরা তপোবনপ্রাণীদের রক্ষার জন্য সতর্ক হও! মৃগয়া-বিহারী রাজা দুষ্যন্ত প্রত্যাসন্ন হইয়াছেন।"

ইহা সমস্ত তপোবনভূমির ক্রন্দন—এবং সেই তপোবনপ্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি! কিন্তু কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

সেই তপোবন হইতে শকুন্তলা যখন যাইতেছে, তখন কণ্ব ডাক দিয়া বলিলেন :—

"ওগো সন্নিহিত তপোবন-তরুগণ !—

তোমাদের জল না করি' দান
যে আগে জল না করিত পান ;
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু ;
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে ;
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায় !

চেতন-অচেতন সকলের সঙ্গে এমনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, এমনি প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন !

শকুন্তলা কহিল, "হলা প্রিয়ংবদে, আর্য্যপুত্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল, তবু আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে আমার পা যেন উঠিতেছে না।" প্রিয়ংবদা কহিল, "তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর তাহা নহে, তোমার আসন্নবিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা—

মৃগের গলি' পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হ'তে !
যেন সে আঁখিজলধার !

শকুন্তলা কণ্বকে কহিল, "তাত, এই যে কুটীর-প্রান্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূ, এ যখন নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিবে, তখন সেই প্রিয়সংবাদ নিবেদন করিবার জন্য একটি লোককে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়ো !"

কণ্ব কহিলেন,—"আমি কখনো ভুলিব না।"

শকুন্তলা পশ্চাৎ হইতে বাধা পাইয়া কহিল, "আরে কে আমার কাপড় ধরিয়া টানে!"

কণ্ব কহিলেন, "বৎসে,—

ইঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হ'লে মুখ যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে
এই মৃগ পুত্র সে তোমার।"

শকুন্তলা তাহাকে কহিল—"ওরে বাছা, সহবাস-পরিত্যাগিনী আমাকে আর কেন অনুসরণ করিস্! প্রসব করিয়াই তোর জননী যখন মরিয়াছিল, তখন হইতে আমিই তোকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছি! এখন আমি চলিলাম, তাত তোকে দেখিবেন, তুই ফিরিয়া যা!"

এইরূপে সমুদয় তরুলতা মৃগপক্ষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করিয়াছে।

লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান—এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্ত্তা বসাইয়া রূপক-নাট্য রচিত হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য্যসাধন করাইয়া লওয়া—এ তো অন্যত্র দেখি নাই।

উত্তর চরিতেও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্দ্য এইরূপ

ব্যক্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাঁদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়সখী, সেখানে ময়ূর ও করি-শিশু তাঁহার কৃতক-পুত্র, তরুলতা তাঁহার পরিজনবর্গ।

টেম্পেষ্ট-নাটকের নামও যেমন, তাহার ভিতরকার ব্যাপারও সেইরূপ। মানুষে-প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে-মানুষে বিরোধ—এবং সে বিরোধের মূলে ক্ষমতালাভের প্রয়াস। ইহার আগাগোড়াই বিক্ষোভ।

মানুষের দুর্বাধ্য প্রবৃত্তি এইরূপ ঝড় তুলিয়া থাকে। শাসন-দমন পীড়নের দ্বারা এই সকল প্রবৃত্তিকে হিংস্রপশুর মতো সংযত করিয়াও রাখিতে হয়। কিন্তু এইরূপ বলের দ্বারা বলকে ঠেকাইয়া রাখা, ইহা কেবল একটা উপস্থিত মতো কাজ চালাইবার প্রণালী-মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ইহাকেই পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। সৌন্দর্য্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত, বিলীন হইয়া যাইবে,ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধাব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্যসাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। ফলাফল নির্ণয় ও বিভীষিকা দ্বারা আমাদিগকে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা বাহিরের কাজ—তাহা দণ্ডনীতি ও ধর্ম্মনীতির আলোচ্য হইতে পারে—কিন্তু উচ্চসাহিত্য অন্তরাত্মার ভিতরের পথটি অবলম্বন করিতে চায় ;—তাহা স্বভাবনিঃসৃত অশ্রুজলের দ্বারা কলঙ্কক্ষালন করে, আন্তরিক ঘৃণার দ্বারা পাপকে দগ্ধ করে এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করে।

কালিদাসও তাঁহার নাটকে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রুবর্ষণে নির্ব্বাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাধিকে লইয়া

অতিমাত্রায় আলোচনা করেন নাই—তিনি তাহার আভাস দিয়া তাহার উপরে একটি আচ্ছাদন টানিয়াছেন। সংসারে এরূপ স্থলে যাহা স্বভাবত হইতে পারিত, তাহাকে তিনি দুর্ব্বাসার শাপের দ্বারা ঘটাইয়াছেন। নতুবা তাহা এমন একান্ত নিষ্ঠুর ও ক্ষোভজনক হইত যে, তাহাতে সমস্ত নাটকের শান্তি ও সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া যাইত। শকুন্তলায় কালিদাস যে রসের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, এরূপ অত্যুৎকট আন্দোলনে তাহা রক্ষা পাইত না। দুঃখবেদনাকে তিনি সমানই রাখিয়াছেন, কেবল বীভৎস কদর্য্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস সেই আবরণের মধ্যে এতটুকু ছিদ্র রাখিয়াছেন, যাহাতে পাপের আভাস পাওয়া যায়। সেই কথার উত্থাপন করি।

পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। সেই অঙ্কের আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য একটুখানি সরাইয়া দেখাইয়াছেন। রাজপ্রেয়সী হংসপদিকা নেপথ্যে সঙ্গীতশালায় আপন মনে বসিয়া গান গাহিতেছেন—

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরী চুমি',
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি ?

রাজান্তঃপুর হইতে ব্যথিত হৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত গান আমাদিগকে বড়ো আঘাত করে। বিশেষ আঘাত করে এই জন্য যে, তাহার পূর্ব্বেই শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের প্রেমলীলা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। ইহার পূর্ব্ব অঙ্কেই শকুন্তলা ঋষিবৃদ্ধ কণ্বের আশীর্ব্বাদ ও সমস্ত অরণ্যানীর মঙ্গলাচরণ গ্রহণ করিয়া বড়ো স্নিগ্ধকরুণ বড়ো পবিত্রমধুর ভাবে পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছে। তাহার জন্য যে প্রেমের—যে গৃহের

চিত্র আমাদের আশাপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে, পরবর্ত্তী অঙ্কের আরম্ভেই সে-চিত্রে দাগ পড়িয়া যায়।

বিদূষক যখন জিজ্ঞাসা করিল—"এই গানটির অক্ষরার্থ বুঝিলে কি ?" রাজা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সকৃৎকৃত-প্রণয়োহয়ং জনঃ—আমরা একবারমাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পরে ছাড়িয়া দিই, সেইজন্য দেবী বসুমতীকে লইয়া আমি ইহার মহৎ ভর্ৎসনের যোগ্য হইয়াছি। সখে মাধব্য; তুমি আমার নাম করিয়া হংসপদিকাকে বলো, 'বড়ো নিপুণভাবে তুমি আমাকে ভৎর্সনা করিয়াছ।' * * * যাও, বেশ নাগরিকবৃত্তি দ্বারা এই কথাটি তাহাকে বলিবে।"

পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্ব্বাসার শাপে যাহা ঘটিয়াছে, স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক।

চতুর্থ অঙ্ক হইতে পঞ্চম অঙ্কে আমরা হঠাৎ আর এক বাতাসে আসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ আমরা যেন একটি মানসলোকে ছিলাম—সেখানকার যে-নিয়ম, এখানকার সে-নিয়ম নহে। সেই তপোবনের সুর এখানকার সুরের সঙ্গে মিলিবে কী করিয়া ? সেখানে যে-ব্যাপারটি সহজ-সুন্দরভাবে অতি অনায়াসে ঘটিয়াছিল, এখানে তাহার কী দশা হইবে, তাহা চিন্তা করিলে আশঙ্কা জন্মে। তাই পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই নাগরিকবৃত্তির মধ্যে যখন দেখিলাম যে, এখানে হৃদয় বড়ো কঠিন, প্রণয় বড়ো কুটিল এবং মিলনের পথ সহজ নহে, তখন আমাদের সেই বনের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন ভাঙিবার মতো হইল। ঋষিশিষ্য শার্ঙ্গরব রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "যেন অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।" শারদ্বত কহিলেন, "তৈলাক্তকে দেখিয়া স্নাত ব্যক্তির, অশুচিকে দেখিয়া শুচি ব্যক্তির, সুপ্তকে দেখিয়া জাগ্রত জনের এবং বদ্ধকে দেখিয়া

স্বাধীন পুরুষের যে ভাব মনে হয়, এই সকল বিষয়ী লোককে দেখিয়া আমার সেইরূপ মনে হইতেছে।"—একটা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন ঋষিকুমারগণ তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন। পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভে কবি নানাপ্রকার আভাসের দ্বারা আমাদিগকে এইভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন যাহাতে শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার অকস্মাৎ অতিমাত্র আঘাত না করে! হংসপদিকার সরল করুণগীত এই ক্রূরকাণ্ডের ভূমিকা হইয়া রহিল।

তাহার পরে প্রত্যাখ্যান যখন অকস্মাৎ বজ্রের মতো শকুন্তলার মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িল, তখন তপোবনের দুহিতা বিশ্বস্ত হস্ত হইতে বাণাহত মৃগীর মতো বিস্ময়ে, ত্রাসে, বেদনায় বিহ্বল হইয়া ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া রহিল। তপোবনের পুষ্পরাশির উপর অগ্নি আসিয়া পড়িল। শকুন্তলাকে অন্তরে বাহিরে ছায়ায়-সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন করিয়া যে একটি তপোবন লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছিল, এই বজ্রাঘাতে তাহা শকুন্তলার চতুর্দ্দিক হইতে চিরদিনের জন্য বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল, শকুন্তলা একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়িল। কোথায় তাত কণ্ব, কোথায় মাতা গৌতমী, কোথায় অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, কোথায় সেই সকল তরুলতাপশু-পক্ষীর সহিত স্নেহের সম্বন্ধ, মাধুর্য্যের যোগ, সেই সুন্দর শান্তি, সেই নির্ম্মল জীবন! এই এক মুহূর্ত্তের প্রলয়াভিঘাতে শকুন্তলার যে কতখানি বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে যে-সঙ্গীতধ্বনি উঠিয়াছিল তাহা এক নিমেষেই নিঃশব্দ হইয়া গেল!

তাহার পরে শকুন্তলার চতুর্দ্দিকে কী গভীর স্তব্ধতা, কী বিরলতা! যে-শকুন্তলা কোমল হৃদয়ের প্রভাবে তাহার চারিদিকের বিশ্ব জুড়িয়া সকলকে আপনার করিয়া থাকিত, সে আজ কী একাকিনী! তাহার সেই বৃহৎ শূন্যতাকে শকুন্তলা আপনার একমাত্র মহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ

করিয়া বিরাজ করিতেছে। কালিদাস যে তাহাকে কণ্বের তপোবনে ফিরাইয়া লইয়া যান নাই, ইহা তাঁহার অসামান্য কবিত্বের পরিচয়। পূর্ব্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার অপূর্ব্ব মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্মন্তভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল—সে-শকুন্তলা আর রহিল না, এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। কালিদাস শকুন্তলার বিরহদুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারিদিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। কবি যদি শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া এরূপ চুপ করিয়াও থাকিতেন, তবু সেই আশ্রম কথা কহিত। সেখানকার তরুলতার ক্রন্দন, সখীজনের বিলাপ, আপনিই আমাদের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকিত। কিন্তু অপরিচিত মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ, নীরব—কেবল বিশ্ববিরহিত শকুন্তলার নিয়ম-সংযত ধৈর্য্য গম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান। এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপরে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়াছেন এবং এই নিষেধের সঙ্কেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব ও সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

দুষ্মন্ত এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন। এই অনুতাপ তপস্যা। এই অনুতাপের ভিতর দিয়া শকুন্তলাকে লাভ না করিলে শকুন্তলা-লাভের কোনো গৌরব ছিল না। হাতে পাইলেই যে পাওয়া, তাহা পাওয়া

নহে—লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়। যৌবনমত্ততার আকস্মিক ঝড়ে শকুন্তলাকে এক মুহূর্ত্তে উড়াইয়া লইলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাইত না। লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। যাহা অনায়াসেই হস্তগত হইয়াছিল তাহা অনায়াসেই হারাইয়া গেল। যাহা আবেশের মুষ্টিতে আহৃত হয় তাহা শিথিলভাবেই স্খলিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে, চিরন্তনভাবে, লাভের জন্য দুষ্মন্ত-শকুন্তলাকে দীর্ঘদুঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত করিলেন! রাজসভায় প্রবেশ করিবামাত্র দুষ্মন্ত যদি তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতেন, তবে শকুন্তলা হংসপদিকার দলবৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অবরোধের একপ্রান্তে স্থান পাইত। বহুবল্লভ রাজার এমন কত সুখলব্ধ প্রেয়সী ক্ষণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু মাত্র লইয়া অনাদরে অন্ধকারে অনাবশ্যক জীবন যাপন করিতেছে!—"সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ।"

শকুন্তলার সৌভাগ্যবশতই দুষ্মন্ত নিষ্ঠুর কঠোরতার সহিত তাহাকে পরিহার করিয়াছিলেন। নিজের উপর নিজের সেই নিষ্ঠুরতার প্রত্যভিঘাতই দুষ্মন্তকে শকুন্তলা সম্বন্ধে আর অচেতন থাকিতে দিল না, অহরহ পরমবেদনার উত্তাপে শকুন্তলা তাঁহার বিগলিত হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল, তাঁহার অন্তর বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া দিল। এমন অভিজ্ঞতা রাজার জীবনে কখনো হয় নাই—তিনি যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। রাজা বলিয়া এ-সম্বন্ধে তিনি হতভাগ্য। ইচ্ছা তাঁহার অনায়াসেই মিটে বলিয়াই সাধনার ধন তাঁহার অনায়ত্ত ছিল। এবারে বিধাতা কঠিন দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন—এখন হইতে তাঁহার নাগরিকবৃত্তি একেবারে বন্ধ।

এইরূপে কালিদাস পাপকে হৃদয়ের ভিতর দিক্ হইতে আপনার অনলে আপনি দগ্ধ করিয়াছেন—বাহির হইতে তাহাকে ছাই-চাপা দিয়া রাখেন নাই। সমস্ত অমঙ্গলের নিঃশেষে অগ্নিসৎকার করিয়া তবে

নাটকখানি সমাপ্ত হইয়াছে,—পাঠকের চিত্ত একটি সংশয়হীন পরিপূর্ণ পরিণতির মধ্যে শান্তিলাভ করিয়াছে। বাহির হইতে অকস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবৃক্ষ জন্মে, ভিতর হইতে গভীরভাবে তাহাকে নির্ম্মূল না করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না। কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখে-কাটা পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্যই কবি গেটে বলিয়াছেন, "তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত্ত্য এবং স্বর্গ যদি কেহ একাধারে পাইতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে।"

শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরম্ভে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে দেখিলাম—সেখানে সরল আনন্দে সে আপন সখীজন ও তরুলতা মৃগের সহিত মিশিয়া আছে। সেই স্বর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ আসিয়া প্রবেশ করিল—স্বর্গসৌন্দর্য্য কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় বিশীর্ণ, স্রস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লজ্জা, সংশয়, দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনুতাপ। এবং সর্ব্বশেষে বিশুদ্ধতর, উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি। শকুন্তলাকে একটি Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।

প্রথম স্বর্গটি বড়ো মৃদু এবং অরক্ষিত—যদিও তাহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মতো তাহা সদ্যঃপাতী। এই সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণতার সৌকুমার্য্য হইতে মুক্তি পাওয়া ভালো—ইহা চিরদিনের নহে এবং ইহাতে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ তৃপ্তি নাই। অপরাধ মত্ত গজের ন্যায় আসিয়া এখানকার পদ্মপত্রের বেড়া ভাঙিয়া দিল—আলোড়নের বিক্ষোভে সমস্ত চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সহজ স্বর্গ এইরূপে সহজেই নষ্ট হইল, বাকি রহিল সাধনার স্বর্গ। অনুতাপের দ্বারা তপস্যার দ্বারা সেই স্বর্গ যখন জিত হইল, তখন আর কোনো শঙ্কা রহিল না। এ স্বর্গ শাশ্বত।

মানুষের জীবন এইরূপ—শিশু যে সরল-স্বর্গে থাকে, তাহা সুন্দর, তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্ষুদ্র। মধ্যবয়সের সমস্ত বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ, সমস্ত অপরাধের আঘাত ও অনুতাপের দাহ জীবনের পূর্ণবিকাশের পক্ষে আবশ্যক। শিশুকালের শান্তির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সংসারের বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যে না পড়িলে পরিণতবয়সের পরিপূর্ণ শান্তির আশা বৃথা। প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ করিয়া তবেই সায়াহ্নের লোকলোকান্তরব্যাপী বিরাম। পাপে-অপরাধে ক্ষণভঙ্গুরকে ভাঙিয়া দেয়, এবং অনুতাপে-বেদনায় চিরস্থায়ীকে গড়িয়া তোলে। শকুন্তলা কাব্যে কবি সেই স্বর্গচ্যুতি হইতে স্বর্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন।

বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশান্ত সুন্দর, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ করে, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকখানির মধ্যে আমরা তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মধ্যে যেটুকু প্রেমালাপ আছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত তাহার অধিকাংশই আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, কালিদাস কোথাও রাশ আল্‌গা করিয়া দেন নাই। অন্য কবি যেখানে লেখনীকে দৌড় দিবার অবসর অন্বেষণ করিত, তিনি সেইখানেই তাহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিয়াছেন। দুষ্যন্ত তপোবন হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া শকুন্তলার কোনো খোঁজ লইতেছেন না। এই উপলক্ষ্যে বিলাপ-পরিতাপের কথা অনেক হইতে পারিত, তবু শকুন্তলার মুখে কবি একটি কথাও দেন নাই। কেবল দুর্ব্বাসার প্রতি আতিথ্যে অনবধান লক্ষ্য করিয়া হতভাগিনীর অবস্থার আমরা যথাসম্ভব কল্পনা করিতে পারি। শকুন্তলার প্রতি কণ্বের একান্ত স্নেহ বিদায়কালে কী সকরুণ গাম্ভীর্য্য ও সংযমের সহিত কত অল্প কথাতেই ব্যক্ত হইয়াছে! অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সখীবিচ্ছেদবেদনা ক্ষণে-ক্ষণে দুটি-একটি কথায় যেন বাঁধ লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া তখনি

আবার অন্তরের মধ্যে নিরস্ত হইয়া যাইতেছে। প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যে ভয়, লজ্জা, অভিমান, অনুনয়, ভর্ৎসনা বিলাপ সমস্তই আছে, অথচ কত অল্পের মধ্যে! যে-শকুন্তলা সুখের সময় সরল অসংশয়ে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিল, দুঃখের সময় দারুণ অপমানকালে সে যে আপন হৃদয়বৃত্তির অপ্রগল্ভ মর্য্যাদা এমন আশ্চর্য্য সংযমের সহিত রক্ষা করিবে, এ কে মনে করিয়াছিল? এই প্রত্যাখ্যানের পরবর্ত্তী নীরবতা কী ব্যাপক, কী গভীর! কণ্ব নীরব, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নীরব, মালিনীতীর-তপোবন নীরব, সর্ব্বাপেক্ষা নীরব শকুন্তলা। হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়ন করিয়া তুলিবার এমন অবসর কি আর কোনো নাটকে এমন নিঃশব্দে উপেক্ষিত হইয়াছে? দুষ্মন্তের অপরাধকে দুর্ব্বাসার শাপের আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখা, সে-ও কবির সংযম। দুষ্টপ্রবৃত্তির দুরন্তপনাকে অবারিতভাবে—উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রলোভন, তাহাও কবি সংবরণ করিরাছেন। তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন—

> ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
> মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।

দুষ্মন্ত যখন কাব্যের মধ্যে বিপুল বিক্ষোভের কারণ লইয়া মত্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন, তখন কবির অন্তরের মধ্যে এই ধ্বনি উঠিল—

> মূর্ত্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
> ধর্ম্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।

তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নের ন্যায় গজরাজ ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এইবার বুঝি কাব্যের শান্তিভঙ্গ হয়—কালিদাস তখনই ধর্ম্মারণ্যের, কাব্যকাননের এই মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নকে শাপের বন্ধনে সংযত করিলেন—ইহাকে দিয়া তাঁহার পদ্মবনের পঙ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিতে দিলেন না।

য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন—সংসারে ঠিক যেমন নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা কিছুই আবৃত করিতেন না। যেন তাঁহাদের পরে সমস্ত দাবী কেবল সংসারের, কাব্যের কোনো দাবী নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই—পথে ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাস-খৎ তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই—কিন্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানিতেই হইবে। কাব্যের প্রত্যেক ঘটনাটিকে সমস্ত কাব্যের সহিত তাঁহাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেই হইবে। তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্ত্তিকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া সত্যের বাহ্যমূর্ত্তিকে তাঁহার কাব্যসৌন্দর্য্যের সহিত সঙ্গত করিয়া লইয়াছেন। তিনি অনুতাপ ও তপস্যাকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাপকে তিরস্করণীর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। শকুন্তলা নাটক প্রথম হইতে শেষ-পর্য্যন্ত যে-একটি শান্তি, সৌন্দর্য্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত,এরূপ না করিলে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক হইত কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী সুকঠোর আঘাত পাইতেন। কবি কালিদাসের করুণনিপুণ লেখনীর দ্বারা তাহা কখনই সম্ভবপর হইত না।

কবি এইরূপে বাহিরের শান্তি ও সৌন্দর্য্যকে কোথাও অতিমাত্র ক্ষুব্ধ না করিয়া তাঁহার কাব্যের আভ্যন্তরিক শক্তিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে সর্ব্বদা সক্রিয় ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি তাঁহার তপোবনের বহিঃপ্রকৃতিও সর্ব্বত্র অন্তরের কাজেই যোগ দিয়াছে। কখনো বা তাহা শকুন্তলার যৌবন-লীলায় আপনার লীলা-মাধুর্য্য অর্পণ করিয়াছে, কখনো বা মঙ্গল আশীর্ব্বাদের সহিত আপনার কল্যাণ-মর্ম্মর মিশ্রিত করিয়াছে, কখনো বা বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতার সহিত আপনার মূক বিদায়বাক্যে করুণা জড়িত করিয়া দিয়াছে এবং অপরূপ মন্ত্রবলে শকুন্তলার চরিত্রের

মধ্যে একটি পবিত্র নির্ম্মলতা—একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের রশ্মি নিয়ত বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই শকুন্তলাকাব্যে নিস্তব্ধতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে নিস্তব্ধভাবে অথচ ব্যাপকভাবে কবির তপোবন এই কাব্যের মধ্যে কাজ করিয়াছে। সে কাজ টেম্পেষ্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবদ্ধ দাসত্বের বাহ্যকাজ নহে—তাহা সৌন্দর্য্যের কাজ, প্রীতির কাজ, আত্মীয়তার কাজ, অভ্যন্তরের নিগূঢ় কাজ!

টেম্পেষ্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি; টেম্পেষ্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি; টেম্পেষ্টে অর্দ্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেষ্টে মিরান্দা সরল মাধুর্য্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে,—শকুন্তলার সরলতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্য্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক, গম্ভীর স্থায়ী। গেটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্ব্বার বলি—শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।

ছেলে-ভুলানো ছড়া

বাঙ্‌লা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটেই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।

আমার কাছে কোন্‌টা ভালো লাগে বা না লাগে সেই কথা বলিয়া সমালোচনার মুখবন্ধ করিতে ভয় হয়। কারণ, যাঁহারা সুনিপুণ সমালোচক, এরূপ সমালোচনাকে তাঁহারা অহমিকা বলিয়া অপরাধ লইয়া থাকেন।

কিন্তু আজ আমি যে-কথা বলিতে বসিয়াছি তাহার মধ্যে আত্ম-কথার কিঞ্চিৎ অংশ থাকিতেই হইবে। ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি, ছেলে-বেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই ছড়াগুলির মাধুর্য্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতি এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণ-শক্তি বর্ত্তমান লেখকের নাই। একথা গোড়াতেই কবুল করা ভালো।

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান" এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য্য এবং উপযোগিতা

কী। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্ঘর্ম্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এই সকল অসঙ্গত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোক-স্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইলেও নূতন।

ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্ত্তনীয় পুরাতন, বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্ত্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্ব্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য;—তাহারা মানব-মনে আপনি জন্মিয়াছে।

আপনি জন্মিয়াছে এ-কথা বলিবার একটু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।—স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্ররূপ ধারণ করে, এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প,—এই আবর্ত্তিত আলোড়িত জগতের

বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ সকল—সর্ব্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ। সেখানেও আমাদিগের নিত্যপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহার জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অলক্ষিত অনাবশ্যক ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

যখন আমরা সচেতনভাবে কোনো একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করি তখন এই সমস্ত গুঞ্জন থামিয়া যায়, এই সমস্ত রেণু-জাল উড়িয়া যায়, এই সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্ত্তের মধ্যে অপসারিত হয়, আমাদের কল্পনা, আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আকাশে পাখীর ডাক, পাতার মর্ম্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি, ছোটো বড়ো কত সহস্র প্রকার কলশব্দ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে কত কম্পন কত আন্দোলন, কত গমন কত আগমন, ছায়ালোকের কতই চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে,—অথচ তাহার মধ্যে কতই যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্য জাল ফেলিয়া একে-বারে এক ক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই তাহাকে এড়াইয়া যায়। সে যখন দেখে তখন ভালো করিয়া শোনে না, যখন শোনে তখন ভালো করিয়া দেখে না, এবং সে যখন চিন্তা করে তখন ভালো করিয়া দেখেও না শোনেও না। তাহার উদ্দেশ্যের পথ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থকে সে অনেকটা পরিমাণে দূর করিয়া দিতে পারে।

কিন্তু সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মতো যে-সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো

সংলগ্ন কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ক্রমাগত মেঘরচনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্ত্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেই জন্যই বলিয়াছিলাম ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপে এইখানে দুই একটি ছড়া উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে পাঠকদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। প্রথমত, এই ছড়াগুলির সঙ্গে চিরকাল যে-স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে আমার মতো মর্য্যাদাভীরু গম্ভীরস্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে? পাঠকগণ আপন গৃহ হইতে আপন বাল্যস্মৃতি হইতে সেই সুধাস্নিগ্ধ স্বরটুকু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সঙ্গীতটি, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্য্য-চ্ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে, সে আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিব?

দ্বিতীয়ত, আটঘাটবাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই সমস্ত গৃহচারিণী অকৃত-বেশা অসংস্কৃতা ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়—যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা। কিন্তু উপায় নাই। আদালতের নিয়মে আদালতের কাজ হয়, প্রবন্ধের নিয়মানুসারে প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়—নিষ্ঠুরতাটুকু অপরিহার্য্য।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ী কাজিতলা দিয়ে॥

কাজি-ফুল কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত-ঝুমঝুম্ পা-ঝুমঝুম্ সীতারামের খেলা॥
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেবো টাপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হ'লো কাঠ।
হেথায় তো জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট॥
ত্রিপূর্ণির ঘাটে ছুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে॥
তা'র বোনকে বিয়ে করি ওড় ফুল দিয়ে॥
ওড় ফুল কুড়োতে হ'য়ে গেলো বেলা।
তা'র বোন্‌কে বিয়ে করি ঠিক ছপুর বেলা॥

ইহার মধ্যে ভাবের পরম্পরসম্বন্ধ নাই সে-কথা নিতান্ত পক্ষপাতী সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইবে। কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে কোনো প্রকার বাছ-বিচার নাই। যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দ্বারবান্ বেটা দিব্য পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো কোনোপ্রকার পরিচয় প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনোরূপ উপলক্ষ্য অন্বেষণ না করিয়া অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া, এমন কি, মাঝে মাঝে লঘুকরস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া কল্পনার অভ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনাগোনা করিতেছে। দ্বারবান্‌টা যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক খাইয়া জাগিয়া উঠিত, তবে সেই মুহূর্তেই তাহারা কে কোথায় দৌড় দিত তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যাইত না।

যমুনাবতী সরস্বতী যিনিই হউন, আগামী কল্য যে, তাঁহার শুভ বিবাহ সে-কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশ্য বিবাহের পর

যথাকালে কাজিতলা দিয়া যে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে সে-কথা আপাতত উত্থাপন না করিলেও চলিত; যাহা হউক, তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোনো প্রকার উদ্যোগ অথবা সে-জন্য কাহারও তিলমাত্র ঔৎসুক্য আছে এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে! সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে যে, কাহাকেও কোনো-কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ব্যস্ত হইতে হয় না। অতএব আগামী কল্য শ্রীমতী যমুনাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সে ঘটনাকে বিন্দুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে কথাটা আদৌ কেন উত্থাপিত হইল তাহার জবাবদিহির জন্যও কেহ ব্যস্ত নহে। কাজি-ফুল যে কী ফুল আমি নগরবাসী তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা স্পষ্ট অনুমান করিতেছি যে, যমুনাবতী নামক কন্যাটির আসন্ন বিবাহের সহিত উক্ত পুষ্পসংগ্রহের কোনো যোগ নাই। এবং হঠাৎ মাঝখান হইতে সীতা-রাম কেন যে হাতের বলয় এবং পায়ের নূপুর ঝুম্‌ঝুম্‌ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গ কারণ দেখাইতে পারিব না। আলোচালের প্রলোভন একটা মস্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ আমাদিগকে সীতারামের আকস্মিক নৃত্য হইতে ভুলাইয়া হঠাৎ ত্রিপূর্ণির ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই ঘাটে দুটি মৎস্য ভাসিয়া উঠা কিছুই আশ্চর্য্য নহে বটে কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুই মৎস্যের মধ্যে একটি মৎস্য যে-লোক লইয়া গেছে তাহার কোনোরূপ উদ্দেশ না পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রচয়িতা কী-কারণে তাহারই ভগিনীকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ স্থিরসংকল্প হইয়া বসিলেন, অথচ প্রচলিত বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ওড়ফুল সংগ্রহ দ্বারা শুভকর্ম্মের আয়োজন যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন

এবং যে লগ্নটি স্থির করিলেন তাহাও নূতন অথবা পুরাতন কোনো পঞ্জিকাকারের মতেই প্রশস্ত নহে!

এই তো কবিতার বাঁধুনি। আমাদের হাতে যদি রচনার ভার থাকিত তবে নিশ্চয় এমন কৌশলে প্লট্ বাঁধিতাম যাহাতে প্রথমোক্ত যমুনাবতীই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সেই ত্রিপূর্ণির ঘাটের অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির অপরিজ্ঞাত ভগ্নীরূপে দাঁড়াইয়া যাইত এবং ঠিক মধ্যাহ্নকালে ওড়ফুলের মালা বদল করিয়া যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ঘটিত তাহাতে সহৃদয় পাঠকমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিতেন।

কিন্তু বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎ সংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্য্যকারণসূত্র ধরিয়া জিনিষকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস জগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না তাহা স্থায়ী হয় না—কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজনশীলতার অভাববশতই বাল্য-স্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। মুহূর্ত্তের মধ্যেই মুঠামুঠা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে পরিণত করা যায়—মনোনীত না হইলে অনায়াসে তাহাকে সংশোধন করা সহজ এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূম করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্ত্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাজ করা আবশ্যক সেখানে কর্ত্তাকেও অবিলম্বে কাজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না—সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মতো

সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এই জন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্ত্যলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ছড়াটিতে সংলগ্নতা নাই, কিন্তু ছবি আছে। কাজিতলা ত্রিপূর্ণির ঘাট এবং ওড়-বনের ঘটনাগুলি স্বপ্নের মতো অদ্ভুত, কিন্তু স্বপ্নের মতো সত্যবৎ

স্বপ্নের মতো সত্য বলাতে পাঠকগণ আমার বুদ্ধির সজাগতা-সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই পণ্ডিত স্বপ্নকে উড়াইতে পারেন নাই। তিনি বলেন প্রত্যক্ষ সত্য নাই—তবে কী আছে? না, স্বপ্ন আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রবল যুক্তি দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করা সহজ কিন্তু স্বপ্নকে অস্বীকার করিবার জো নাই। কেবল সজাগ স্বপ্ন নহে, নিদ্রাগত স্বপ্ন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতেরও সাধ্য নাই স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে অবিশ্বাস করেন। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারা সম্ভব সত্যকেও সন্দেহ করিতে ছাড়েন না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাঁহারা চরমতম অসম্ভবকে অসংশয়ে গ্রহণ করেন। অতএব বিশ্বাস-জনকতা নামক যে গুণটি সত্যের সর্ব্বপ্রধান গুণ হওয়া উচিত, সেটি স্বপ্নের যেমন আছে এমন আর কিছুরই নাই।

এতদ্দ্বারা পাঠক এই কথা বুঝিবেন যে, প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্ন-জগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য। এইজন্য অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি এবং তাহারা অসম্ভবকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'লো তিন কন্যে দান॥

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥

এ-বয়সে এই ছড়াটি শুনিবামাত্র বোধ করি প্রথমেই মনে হয়, শিবুঠাকুর যে তিনটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন তন্মধ্যে মধ্যমা কন্যাটিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। কিন্তু এক বয়স ছিল যখন এতাদৃশ চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। তখন এই চারিটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূতের মতো ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘনমেঘান্ধকার বাদ্‌লার দিন এবং উত্তালতরঙ্গিত নদী মূর্ত্তিমান্ হইয়া দেখা দিত। তাহার পর দেখিতে পাইতাম সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটিদুয়েক পান্সী নৌকা বাঁধা আছে এবং শিবুঠাকুরের নববিবাহিতা বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, শিবুঠাকুরের জীবনটিকে বড়ো সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইত। এমন কি, তৃতীয়া বধূ ঠাকুরাণী মর্ম্মান্তিক রাগ করিয়া দ্রুতচরণে বাপের বাড়ি-অভিমুখে চলিয়াছেন সেই ছবিতেও আমার এই সুখচিত্রের কিছু-মাত্র ব্যাঘাত সাধন করিতে পারে নাই। এই নির্ব্বোধ তখনও বুঝিতে পারিত না ঐ একটি মাত্র ছত্রে হতভাগ্য শিবুঠাকুরের জীবনে কী এক হৃদয়বিদারক শোকাবহ পরিণাম সূচিত হইয়াছে! কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চরিত্রবিশ্লেষণ অপেক্ষা চিত্রবিরচনের দিকেই তখন মনের গতিটা ছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি হতবুদ্ধি শিবুঠাকুর তদীয় কনিষ্ঠ জায়ার অকস্মাৎ পিতৃগৃহপ্রয়াণ দৃশ্যটিকে ঠিক মনোরম চিত্র হিসাবে দেখেন নাই।

এই শিবুঠাকুর কি কস্মিন্ কালে কেহ ছিল এক একবার একথাও মনে উদয় হয়। হয় তো বা ছিল। হয় তো এই ছড়ার মধ্যে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। আর কোনো ছড়ায় হয় তো বা ইহার আর এক টুক্‌রা থাকিতে পারে।

এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর॥
শিব গেল শ্বশুর বাড়ি বস্‌তে দিল পিঁড়ে।
জলপান করিতে দিল শালিধানের চিঁড়ে॥
শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খই।
মোটা মোটা সব্‌রি কলা, কাগ্‌মারে দই॥

ভাবেগতিকে আমার সন্দেহ হইতেছে শিবুঠাকুর এবং শিবু সদাগর লোকটি একই হইবেন। দাম্পত্যসম্বন্ধে উভয়েরই একটু বিশেষ সখ আছে, এবং বোধ করি আহারসম্বন্ধেও অবহেলা নাই। উপরন্তু গঙ্গার মাঝখানটিতে যে স্থানটুকু নির্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহাও নব-পরিণীতের প্রথম-প্রণয়-যাপনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান।

এইস্থলে পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, প্রথমে অনবধানতাক্রমে শিবু সদাগরের জলপানের স্থলে শালিধানের চিঁড়ার উল্লেখ করা হইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে "শালিধানের চিঁড়ে নয় রে বিন্নিধানের খই!" যেন ঘটনার সত্যসম্বন্ধে তিলমাত্র স্খলন হইবার জো নাই। অথচ এই সংশোধনের দ্বারা বর্ণিত ফলাহারের খুব যে একটা ইতরবিশেষ হইয়াছে, জামাই-আদর-সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ির গৌরব খুব উজ্জ্বলতররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে শ্বশুর-বাড়ির মর্য্যাদা অপেক্ষা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার প্রতি কবির যে অধিক লক্ষ্য দেখা যাইতেছে, তাও ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি ইহাও স্বপ্নের মতো। বোধ করি শালিধানের চিঁড়া দেখিতে দেখিতে পরমুহূর্ত্তে বিন্নিধানের খই হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি শিবুঠাকুরও কখন এম্‌নি করিয়া শিবুসদাগরে পরিণত হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না।

শুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষ মধ্যে কতকগুলি টুক্‌রা গ্রহ

আছে। কেহ কেহ বলেন একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুক্‌রা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতে একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

অবশ্য বালকের কল্পনা এই ঐতিহাসিক ঐক্য-রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং তাহার নিকট বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে অসংলগ্ন ছবি যেন পাখীর ঝাঁকের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দ্রুতগতিতে বালকের চিত্ত উপর্যুপরি নব নব আঘাত পাইয়া বিচলিত হইতে থাকে।

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে॥
দু পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে॥
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে।
ঝুমু ঝুমু চুলগাছটি ঝাড়্‌তে লেগেছে॥
কে রেখেছে কে রেখেছে দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্ খান্ দে, বকুলতলা দে॥
বকুলফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম্ মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতেনাথের খেলা॥

সীতেনাথ বলে রে ভাই চাল-কড়াই খাবো।
চাল-কড়াই খেতে খেতে গলা হ'লো কাঠ।
হেথা হোথা, জল পাব চিৎপুরের মাঠ॥
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক করে।
সোনা-মুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

ইহার মধ্যে কোনো ছবিই আমাদিগকে ধরিয়া রাখে না, আমরাও কোনো ছবিকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। ঝোঁটনবিশিষ্ট নোটন-পায়রাগুলি, বড়ো সাহেবের বিবিগণ, দুই পারে ভাসমান দুই কই কাৎলা, পরপারে স্নাননিরত দুই মেয়ে, দাদার বিবাহ, রামধনুকের বাদ্যসহকারে সীতানাথের খেলা, এবং মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে তপ্তবালুকাচিক্কণ মাঠের মধ্যে খরতাপক্লিষ্ট রক্তমুখচ্ছবি—এ সমস্তই স্বপ্নের মতো। ওপারে যে দুইটি মেয়ে নাহিতে বসিয়াছে এবং দুই হাতের চুড়িতে চুড়িতে ঝুনঝুন্ শব্দ করিয়া চুল ঝাড়িতেছে তাহারা ছবির হিসাবে প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে অপরূপ স্বপ্ন।

এ-কথাও পাঠকদের স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, স্বপ্ন রচনা করা বড়ো কঠিন। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। সংসারের সকল কার্যেই আমাদের এমনি অভ্যাস হইয়া গেছে যে, সহজভাবের অপেক্ষা সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না ডাকিলেও ব্যস্তবাগীশ চেষ্টা সকল কাজের মধ্যে আপনি আসিয়া হাজির হয়। এবং সে যেখানেই হস্তক্ষেপ করে সেইখানেই তার আপন লঘু মেঘাকার ত্যাগ করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহার আর বাতাসে উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা

সর্বাপেক্ষা সরল তাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন; সহজের প্রধান লক্ষণই এই।

পাঠক বোধ করি ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন আমাদের প্রথমোদ্ধৃত ছড়াটির সহিত এই ছড়া কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেমন মেঘে মেঘে স্বপ্নে স্বপ্নে মিলাইয়া যায়, এই ছড়াগুলিও তেমনি পরস্পর জড়িত মিশ্রিত হইতে থাকে, সে-জন্য কোনো কবি চুরির অভিযোগ করেন না এবং কোনো সমালোচকও ভাব-বিপর্যয়ের দোষ দেন না। বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই। সেখানে পুলিশ বা আইনকানুনের কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না।

অন্যত্র হইতে প্রাপ্ত নিম্নের ছড়াটির প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখুন।

ওপারে জঙ্গি গাছটি জঙ্গি বড়ো ফলে।
গো জঙ্গির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে হাইঢাই গলা হ'লো কাঠ।
কতক্ষণে যাবো রে ভাই হর-গৌরীর মাঠ।
হর গৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান।
পান কিন্‌লাম, চুন কিন্‌লাম, ননদে ভাজে খেলাম।
একটি পান হারালে দাদাকে বলে দেলাম।
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইকো বাড়ি।
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি।
আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে।
সুবল নিয়ে যাবো আমি দিগ্‌নগর দিয়ে।
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে।
মোটামোটা চুলগুলি গো পেতে বসেছে।
চিকন্ চিকন্ চুলগুলি ঝাড়্‌তে লেগেছে।

হাতে তাদের দেব-শাঁখা মেঘ লেগেছে।
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে॥
পরণে তা'র ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে।
নাল গামছা দিয়ে॥
অশথের পাতা ধনে।
গৌরী বেটী ক'নে॥
নকা বেটা বর।
ঢ্যাম কুড়্ কুড়্ বাদ্দি বাজে চড়ক-ডাঙায় ঘর॥

এই সকল ছড়ার মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। প্রথম ছড়ায় দেখিয়াছি আলোচাল খাইয়া সীতারামনামক নৃত্যপ্রিয় লুব্ধ বালকটিকে ত্রিপূর্ণির ঘাটে জল খাইতে যাইতে হইয়াছিল; দ্বিতীয় ছড়ায় দেখিতে পাই সীতানাথ চাল-কড়াই খাইয়া জলের অন্বেষণে চিৎপুরের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় ছড়ায় দেখা যাইতেছে—সীতারামও নহে সীতানাথও নহে, পরন্তু কোনো এক হতভাগিনী ভ্রাতৃজায়ার বিদ্বেষপরায়ণা ননদিনী জন্তি-ফল ভক্ষণের পর তৃষাতুর হইয়া হর-গৌরীর মাঠে পান খাইতে গিয়াছিল, এবং পরে, অসাবধানা ভ্রাতৃবধূর তুচ্ছ অপরাধটুকু দাদাকে বলিয়া দিবার জন্য পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল।

এই তো তিন ছড়ার মধ্যে অসঙ্গতি। তার পর প্রত্যেক ছড়ার নিজের মধ্যেও ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। বেশ বুঝা যায় অধিকাংশ কথাই বানানো। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, কথা বানাইতে গেলে লোকে প্রমাণের প্রাচুর্য্য দ্বারা সেটাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকতর

বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলে ; অথচ এক্ষেত্রে সে-পক্ষে খেয়াল-মাত্র নাই। ইহাদের কথা সত্যও নহে মিথ্যাও নহে ; তুইয়ের বা'র। ঐ যে ছড়ার এক জায়গায় সুবলের বিবাহের উল্লেখ আছে, সেটা কিছু অসম্ভব ঘটনা নহে। কিন্তু সত্য বলিয়াও বোধ হয় না। "দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নেইকো বাড়ি ; সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি।" যেমনই সুবলের নামটা মুখে আসিল অম্‌নিই বাহির হইয়া গেল—"আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে।" সে কথাটাও স্থায়ী হইল না, অনতিবিলম্বেই দিগ্‌নগরের দীর্ঘকেশা মেয়েদের কথা উঠিল। স্বপ্নেও ঠিক এইরূপ ঘটে। হয়তো শব্দসাদৃশ্য অথবা অন্য কোনো অলীক তুচ্ছ সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্তে একটা কথা হইতে আর একটা কথা রচিত হইয়া উঠিতে থাকে। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে তাহাদের সম্ভাবনার কোনোই কারণ ছিল না, মুহূর্ত্তকাল পরেও তাহারা সম্ভাবনার রাজ্য হইতে বিনাচেষ্টায় অপসৃত হইয়া যায়। সুবলের বিবাহকে যদি-বা পাঠকগণ তৎকালীন ও তৎস্থানীয় কোনো সত্য ঘটনার আভাস বলিয়া জ্ঞান করেন, তথাপি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন "নাল গাম্‌ছা দিয়ে টিয়ের মার বিয়ে" কিছুতেই সাময়িক ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। কারণ বিধবা-বিবাহ টিয়ে জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও নাল গাম্‌ছার ব্যবহার উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কস্মিন কালে শুনা যায় নাই। কিন্তু যাহাদের কাছে ছন্দের তালে তালে সুমিষ্ট কণ্ঠে এই সকল অসংলগ্ন অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তাহারা বিশ্বাসও করে না, সন্দেহও করে না, তাহারা মনশ্চক্ষে স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষবৎ ছবি দেখিয়া যায়।

বালকেরা ছবিও অতিশয় সহজে স্বল্পায়োজনে দেখিতে পায়। বালক যত সহজে ইচ্ছামাত্রই সৃজন করিতে পারে আমরা তেমন পারি না। ভাবিয়া দেখো একটা গ্রন্থিবাঁধা বস্ত্রখণ্ডকে মুণ্ডবিশিষ্ট মনুষ্য

কল্পনা করিয়া তাহাকে আপনার সন্তানরূপে লালন করা সামান্য ব্যাপার নহে। আমাদের একটা মূর্ত্তিকে মানুষ বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে ঠিক সেটাকে মানুষের মতো গড়িতে হয়—সেখানে যতটুকু অনুকরণের ত্রুটি থাকে তাহাতেই আমাদের কল্পনার ব্যাঘাত করে। বহির্জগতের জড়ভাবের শাসনে আমরা নিয়ন্ত্রিত; আমাদের চক্ষে যাহা পড়িতেছে আমরা কিছুতেই তাহাকে অন্যরূপে দেখিতে পারি না। কিন্তু শিশু চক্ষে যাহা দেখিতেছে তাহাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আপন মনের মতো জিনিষ মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারে, মনুষ্যমূর্ত্তির সহিত বস্ত্রখণ্ড-রচিত খেলনকের কোনো বৈসাদৃশ্য তাহার চক্ষে পড়ে না, সে আপনার ইচ্ছা-রচিত সৃষ্টিকেই সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া দেখে।

কিন্তু তথাপি ছড়ার এই সকল অযত্নরচিত চিত্রগুলি কেবল যে বালকের সহজ সৃজনশক্তি দ্বারা সৃজিত হইয়া উঠে তাহা নহে; তাহার অনেক স্থানে রেখার এমন সুস্পষ্টতা আছে যে,তাহারা আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতি সংক্ষেপে বর্ণনায় ত্বরিত-চিত্র আনিয়া উপস্থিত করে।

এই ছবিগুলি একটি-রেখা একটি-কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বালকের চিত্তে তেম্‌নি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়। অংশ যোজনা করিয়া কিছু গড়িয়া তুলিলে চলিবে না। "চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক করে" এই একটিমাত্র কথায় একটি বৃহৎ অনুর্ব্বর মাঠ মধ্যাহ্নের রৌদ্রালোকে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া উদয় হয়।

"পরণে তা'র ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।" ডুরে শাড়ির ডোরা রেখাগুলি ঘূর্ণাজলের আবর্ত্ত ধারার মতো, তনুগাত্রযষ্টিকে যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া ধরে তাহা ঐ এক ছত্রে এক মুহূর্ত্তে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার পাঠান্তরে আছে, "পরণে তা'র ডুরে কাপড় উড়ে পড়েছে"—সে ছবিটিও মন্দ নহে।

আয় ঘুম আয় ঘুম বাগদি-পাড়া দিয়ে।
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে॥

ঐ শেষ ছত্রে জালমুড়ি দিয়া বাগ্‌দিদের ছেলেটা যেখানে-সেখানে পড়িয়া কিরূপ অকাতরে ঘুমাইতেছে সে ছবি পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক কিছু নহে ঐ জাল মুড়ি দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া বলাতেই বাগদি-সন্তানের ঘুম বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধর্‌তে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুট্‌লো দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি গুণ্‌তে গুণ্‌তে যাই॥
এ নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর্‌ঝুর্ করে।
চাঁদ-মুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥

দোলায় করিয়া ছয়পণ কড়ি গুণিতে গুণিতে যাওয়াকে যদি পাঠকেরা ছবির হিসাবে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন তথাপি শেষ তিন ছত্রকে তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন না। নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করিতেছে এবং তীরের বালি ঝুর্‌ঝুর্ করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, বালুতটবর্ত্তী নদীর এমন সংক্ষিপ্ত সরল অথচ সুস্পষ্ট ছবি আর কী হইতে পারে!

এই তো এক শ্রেণীর ছবি গেল। আর এক শ্রেণীর ছবি আছে যাহা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেয়। হয়তো একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বঙ্গ-গৃহ বঙ্গ-সমাজ সজীব হইয়া উঠিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সে-সমস্ত তুচ্ছ কথা বড়ো বড়ো সাহিত্যে তেমন সহজে তেমন অবাধে তেমন অসঙ্কোচে প্রবেশ করিতে পারে না; এবং প্রবেশ করিলেও আপনিই তাহার রূপান্তর ও ভাবান্তর হইয়া যায়।

দাদাগো দাদা শহরে যাও।
তিন টাকা ক'রে মাইনে পাও॥
দাদার গলায় তুলসী মালা।
বউ বরণে চন্দ্রকলা॥
হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি॥

দাদার বেতন অধিক নহে—কিন্তু বোন্‌টির মতে তাহাই প্রচুর। এই তিন টাকা বেতনের স্বচ্ছলতার উদাহরণ দিয়াই ভগ্নীটি অনুনয় করিতেছেন—

হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি॥

চতুরা বালিকা নিজের এই স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দাদাকেও প্রলোভনের ছলে আভাস দিতে ছাড়ে নাই যে, "বউ বরণে চন্দ্রকলা।" যদিও ভগ্নীর খেলনাটি তিন টাকা বেতনের পক্ষে অনেক মহার্ঘ্য, তথাপি নিশ্চয় বলিতে পারি তাহার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব হয় নাই, এবং সেটা কেবলমাত্র সৌভ্রাত্রবশত নহে।

উলু উলু মাদারের ফুল।
বর আস্‌ছে কতদূর॥
বর আস্‌ছে বাগ্‌না-পাড়া।
বড়ো বউগো রান্না চড়া॥
ছোটো বউলো জল্‌কে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা॥
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা॥
ফুলের বরণ কড়ি।
ন'টে শাকের বড়ি॥

জামাতৃসমাগম-প্রত্যাশিতা পল্লীরমণীগণের ঔৎসুক্য এবং আনন্দ-উৎসবের ছবি আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উপলক্ষ্যে শেওড়া-গাছের বেড়া-দেওয়া পাড়াগাঁয়ের পথ-ঘাট বন পুষ্করিণী ঘট কক্ষ বধূ এবং শিথিলগুণ্ঠন ব্যস্তসমস্ত গৃহিণীগণ ইন্দ্রজালের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে।

এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ায় প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাঙ্লা দেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সঙ্গীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সমস্ত অধিক পরিমাণে উদ্ধৃত করিতে আশঙ্কা করি, কারণ, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"।

ছবি যদি কিছু অদ্ভুত গোছের হয় তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালোই। কারণ, নূতনত্বে চিত্তে আরো অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছুই নাই, কারণ তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই। সে এখনও জগতে সম্ভাব্যতার শেষ-সীমাবর্ত্তী প্রাচীরে গিয়া চারিদিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সে বলে যদি কিছুই সম্ভব হয় তবে সকলি সম্ভব। একটা জিনিষ যদি অদ্ভুত না হয় তবে আর একটা জিনিষই বা কেন অদ্ভুত হইবে? সে বলে একমুণ্ড-ওয়ালা মানুষকে আমি কোনো প্রশ্ন না করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি, কারণ, সে আমার নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়াছে; দুইমুণ্ড-ওয়ালা মানুষের সম্বন্ধেও আমি কোনো বিরুদ্ধ প্রশ্ন করিতে চাহি না, কারণ, আমি তো তাহাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি; আবার স্কন্ধকাটা মানুষও আমার পক্ষে সমান সত্য, কারণ সে তো আমার অনুভবের অগম্য নহে। একটি গল্প আছে, কোনো লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিল, আজ পথে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আসিলাম; বিবাদে একটি লোকের মুণ্ড কাটা পড়িল তথাপি সে দশ পা চলিয়া গেল। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বল কি হে! দশ পা চলিয়া গেল? তাঁহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিলেন তিনি বলিলেন—দশ

পা চলা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। উহার সেই প্রথম পা চলাটাই আশ্চর্য্য!—

সৃষ্টিরও সেইরূপ প্রথম পদক্ষেপটাই মহাশ্চর্য্য, কিছু যে হইয়াছে ইহাই প্রথম বিস্ময় এবং পরম বিস্ময়ের বিষয়, তাহার পরে আরো যে কিছু হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য কী! বালক সেই প্রথম আশ্চর্য্যটার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করিতেছে—সে চক্ষু মেলিবামাত্র দেখিতেছে অনেক জিনিষ আছে, আরো অনেক জিনিষ থাকাও তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, এই জন্য ছড়ার দেশে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে সীমানা ঘটিত কোনো বিবাদ নাই।

আয়রে আয় টিয়ে।
নায়ে ভরা দিয়ে॥
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে॥
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা'।
খোকার নাচন দেখে যা॥

প্রথমত, টিয়ে পাখী নৌকা চড়িয়া আসিতেছে এমন দৃশ্য কোনো বালক তাহার পিতার বয়সেও দেখে নাই; বালকের পিতার সম্বন্ধেও সে-কথা খাটে। কিন্তু সেই অপূর্ব্বতাই তাহার প্রধান কৌতুক। বিশেষত হঠাৎ যখন অগাধ জলের মধ্য হইতে একটা স্ফীতকায় বোয়াল মাছ উঠিয়া, বলা নাই কহা নাই খামকা তাহার নৌকাখানা লইয়া চলিল, এবং ক্রুদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত টিয়া মাথার রোঁয়া ফুলাইয়া পাখা ঝাপ্‌টাইয়া অত্যুচ্চ চীৎকারে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকিল, তখন কৌতুক আরও বাড়িয়া উঠে। টিয়ে বেচারার দুর্গতি এবং জলচর প্রাণীটার নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার দেখিয়া অকস্মাৎ ভোঁদড়ের দুর্নিবার নৃত্য-স্পৃহাও বড়ো চমৎকার। এবং সেই আনন্দনর্ত্তনপর নিষ্ঠুর

ভোঁদড়টিকে নিজের নৃত্যবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক খোকার নৃত্য দেখিবার জন্ম ফিরিয়া চাহিতে অনুরোধ করার মধ্যেও বিস্তর রস আছে। যেমন মিষ্ট ছন্দ শুনিলেই তাহাকে বাঁধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে, তেমনি এই সকল ভাষার চিত্র দেখিলেই ইহাদিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হায়, এ-সকল চিত্রের রস নষ্ট না করিয়া—ইহাদের বাল্য সরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভবতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায়, এবং বোধ করি সর্ব্বত্রই দুর্ল্ভ।

খোকা যাবে মাছ ধ'র্‌তে ক্ষীর-নদীর কূলে।
ছিপ্ নিয়ে গেল কোলা বেঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে॥
খোকা বলে পাখিটি কোন্ বিলে চরে।
"খোকা" বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে॥

ক্ষীর-নদীর কূলে মাছ ধরিতে গিয়া খোকা যে কী সঙ্কটেই পড়িয়াছিল তাহা কি তুলি দিয়া না আঁকিলে মনের ক্ষোভ মেটে? অবশ্য, ক্ষীর-নদীর ভূগোলবৃত্তান্ত খোকাবাবু আমাদের অপেক্ষা অনেক ভালো জানেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নদীতেই হোক্ তিনি যে প্রাজ্ঞোচিত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পরম গম্ভীরভাবে নিজ আয়তনের চতুর্গুণ দীর্ঘ এক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট কৌতুকাবহ, তাহার উপর যখন জল হইতে ড্যাবা চক্ষু মেলিয়া একটা অত্যন্ত উৎকট-গোছের কোলা বেঙ্ খোকার ছিপ লইয়া টান মারিতেছে এবং অন্য দিকে ডাঙা হইতে চিল আসিয়া মাছ ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়াছে, তখন তাঁহার বিব্রত বিস্মিত ব্যাকুল মুখের ভাব—একবার প্রাণপণ শক্তিতে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিপ লইয়া টানাটানি, একবার বা সেই উড্ডীন চোরের উদ্দেশে দুই উৎসুক ব্যগ্র হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপে—

এ সমস্ত চিত্র সুনিপুণ সহৃদয় চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।

আবার খোকার পক্ষী-মূর্তিও চিত্রের বিষয় বটে। মস্ত একটা বিল চোখে পড়িতেছে। তাহার ওপারটা ভালো দেখা যায় না। এ-পারে তীরের কাছে একটা কোণের মতো জায়গায় বড়ো বড়ো ঘাস,বেতের ঝাড় এবং ঘন কচুর সমাবেশ ; জলে শৈবাল এবং নালফুলের বন ; তাহারই মধ্যে লম্বচঞ্চু দীর্ঘপদ গম্ভীরপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ গোটাকতক বক-সারসের সহিত মিশিয়া খোকাবাবু ডানা গুটাইয়া নতশিরে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে চরিয়া বেড়াইতেছেন এ দৃশ্যটিও বেশ ;—এবং বিলের অনতিদূরে ভাদ্রমাসের জলমগ্ন পক্কশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের সংলগ্ন একটি কুটীর ; সেই কুটীর-প্রাঙ্গণে বাঁশের বেড়ার উপরে বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বিলের অভিমুখে সম্পূর্ণ প্রসারিত করিয়া দিয়া অপরাহ্ণের অবসান-সূর্য্যালোকে জননী তাঁহার খোকাবাবুকে ডাকিতেছেন ; বেড়ার নিকটে ঘরে-ফেরা বাঁধা গোরুটিও স্তিমিত কৌতূহলে সেইদিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এবং ভোজনতৃপ্ত খোকাবাবু নালবন শৈবালবনের মাঝখানে হঠাৎ মায়ের ডাক শুনিয়া সচকিতে কুটীরের দিকে চাহিয়া উড়ি-উড়ি করিতেছে, সে ও সুন্দর দৃশ্য ;—এবং তাহার তৃতীয় দৃশ্যে পাখীটি মা'র বুকে গিয়া তাঁহার কাঁধে মুখ লুকাইয়াছে এবং ডানায় তাঁহাকে অনেকটা ঝাঁপিয়া ফেলিয়াছে এবং নিমীলিত-নেত্র মা দুই হস্তে সুকোমল ডানাসুদ্ধ তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিবিড় স্নেহবন্ধনে বুকে বাঁধিয়া ধরিয়াছেন, সে-ও সুন্দর দেখিতে হয়।

জ্যোতির্বিদ্‌গণ ছায়াপথের নীহারিকা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান সেই জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পরাশির মধ্যে এক এক জায়গায় যেন বাষ্প সংহত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের এই ছড়ার নীহারিকা-রাশির মধ্যেও সহসা স্থানে স্থানে

সেইরূপ অর্দ্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্ত্তি দৃষ্টি-পথে পড়ে। সেই সকল নবীনসৃষ্ট কল্পনামণ্ডলের মধ্যে জটিলতা কিছু নাই,—প্রথম বয়সের শিশু-পৃথিবীর ন্যায় এখনও সে কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায় আছে, কঠিন হইয়া উঠে নাই। একটা উদ্ধৃত করি—

"যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ।"
'কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥"
"যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ॥"
"বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ॥"
"যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ॥"
"জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর॥"
"যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ॥"
"নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন্-সতীনের ঘর॥"
"যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ॥"
"হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥"

কবিসম্প্রদায় কবিত্ব-সৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে বিবিধ ভাষায় বিচিত্র

ছন্দে নারী জাতির স্তব গান করিয়া আসিতেছেন কিন্তু উপরি উদ্ধৃত স্তব-গানের মধ্যে যেমন একটি সরল সহজ ভাব এবং একটি সরল সহজ চিত্র আছে এমন অতি অল্প কাব্যেই পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটুখানি সরল কৌতুকও আছে। সীতার ধনুক-ভাঙা এবং দ্রৌপদীর লক্ষ্যবেধ পণ খুব কঠিন পণ ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সরলা কন্যাটি যে পণ করিয়া বসিয়াছে সেটি তেমন কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীতে এত কালো ধলো রাঙা মিষ্টি আছে, যে, তাহার মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র নমুনা দেখাইয়া এমন কন্যা লাভ করা ভাগ্যবানের কাজ। আজকাল কলির শেষ দশায় সমস্ত পুরুষের ভাগ্য ফিরিয়াছে; ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যবেধ, বিচারে জয়—এ সমস্ত কিছুই আবশ্যক হয় না; উল্টিয়া তাঁহারাই কোম্পানির কাগজ পণ করিয়া বসেন, এবং সেই কাপুরুষোচিত নীচতার জন্য তিলমাত্র আত্মগ্লানি অনুভব করেন না। ইহা অপেক্ষা, আমাদের আলোচিত ছড়াটির নায়ক মহাশয়কে যে সামান্য সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কন্যা লাভ করিতে হইয়াছিল সে-ও অনেক ভালো। যদিও পরীক্ষার শেষ ফল উক্ত ছড়াটির মধ্যে পাওয়া যায় নাই তথাপি অনুমানে বলিতে পারি লোকটি পূরা নম্বর পাইয়াছিল। কারণ, দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক শ্লোকের চারিটি উত্তরের মধ্যে চতুর্থ উত্তরটি দিব্য সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষয়িত্রী যখন স্বয়ং সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন তখন সে উত্তরগুলি জোগানো আমাদের নায়কের পক্ষে যে কিছুমাত্র কঠিন হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না, ও যেন ঠিক বই খুলিয়া উত্তর দেওয়ার মতো। কিন্তু সেজন্য নিষ্ফল ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিতে চাহি না। যিনি পরীক্ষক ছিলেন তিনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই।

প্রথম ছত্রেই কন্যা কহিতেছেন "যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এ তো

বড়ো রঙ্গ !" ইহা হইতে বোধ হইতেছে, পরীক্ষা আরো পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে এবং পরীক্ষার্থী এমন মনের মতো আনন্দজনক উত্তরটি দিয়াছে যে, কন্যার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে! বাস্তবিক এমন রঙ্গ আর কিছু নাই।

যাহা হউক, আমাদের উপরে এই ছড়াটি রচনার ভার থাকিলে খুব সম্ভব ভূমিকাটা রীতিমত ফাঁদিয়া বসিতাম; এমন আচম্‌কা মাঝখানে আরম্ভ করিতাম না! প্রথমে একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম, সেটা যদি-বা ঠিক সেনেট-হলের মতো না হইত, অনেকটা ঈডন্ গার্ডনের অনুরূপ হইতে পারিত। এবং তাহার সহিত জ্যোৎস্নার আলোক, দক্ষিণের বাতাস এবং কোকিলের কুহুধ্বনি যোগ করিয়া ব্যাপারটিকে বেশ একটুখানি জম্‌-জমাট করিয়া তুলিতাম—আয়োজন অনেক রকম করিতে পারিতাম; কিন্তু এই সরল সুন্দর কন্যাটি যাহার মাথার কেশ ফিঙের অপেক্ষা কালো, হাতের শাঁখা রাজহংসের অপেক্ষা ধলো, সিঁথার সিন্দুর কুসুমফুলের অপেক্ষা রাঙা, স্নেহের কোল ছেলেদের কথার অপেক্ষা মিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল শীতল জলের অপেক্ষা স্নিগ্ধ—সেই মেয়েটি—যে-মেয়ে সামান্য কয়েকটিমাত্র স্তুতিবাক্য শুনিয়া সহজ বিশ্বাসে ও সরল আনন্দে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে আমাদের সেই বর্ণনাবহুল মাজ্জিত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে এমন করিয়া চিরকালের মতো ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না।

কেবল এই ছড়াটি কেন, আমাদের উপর ভার দিলে আমরা অধিকাংশ ছড়াই সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া নূতন সংস্করণের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। এমন কি, উহাদের মধ্যে সর্ব্বজনবিদিত নীতি এবং সর্ব্বজনদুর্ব্বোধ তত্ত্বজ্ঞানেরও বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারি; কিছু না হউক, উহাদিগকে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উন্নততর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি। বিবেচনা করিয়া দেখুন আমরা

যদি কখনো আমাদের বর্ত্তমান সভ্যসমাজে চাঁদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে ইচ্ছা করি তবে কি তাহাকে নিম্নলিখিতরূপে তুচ্ছ প্রলোভন দেখাইতে পারি ?

আয় আয় চাঁদা মামা টি দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
মাছ কুট্‌লে মুড়ো দেবো,
ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেবো,
কালো গোরুর দুধ দেবো,
দুধ খাবার বাটি দেবো,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী নিয়ে যা !

এ কোন্ চাঁদ ! নিতান্তই বাঙালীর ঘরের চাঁদ। এ আমাদের বাল্যসমাজের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সাধারণ মাতুল চাঁদা। এ আমাদের গ্রামের কুটীরের নিকটে বায়ু-আন্দোলিত বাঁশ-বনের রন্ধ্রগুলির ভিতর দিয়া পরিচিত স্নেহহাস্যমুখে প্রাঙ্গণধূলিবিলুণ্ঠিত উলঙ্গ শিশুর খেলা দেখিয়া থাকে ; ইহার সঙ্গে আমাদের গ্রামসম্পর্ক আছে। নতুবা এত বড়ো লোকটা—যিনি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রসুন্দরীর অন্তঃপুরে বর্ষ যাপন করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত সুরলোকের সুধারস আপনার অক্ষয় রৌপ্য-পাত্রে রাত্রিদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—সেই শশলাঞ্ছন হিমাংশু-মালীকে মাছের মুড়ো ধানের কুঁড়ো কালো গোরুর দুধ খাবার বাটির প্রলোভন দেখাইতে কে সাহস করিত ! আমরা হইলে বোধ করি পারিজাতের মধু, রজনীগন্ধার সৌরভ, বৌ-কথা-কওয়ের গান, মিলনের হাসি, হৃদয়ের আশা, নয়নের স্বপ্ন, নববধূর লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ অপূর্ব্ব-জাতীয় দুর্লভ পদার্থের ফর্দ্দ করিয়া বসিতাম—অথচ চাঁদ তখনো যেখানে ছিল এখনো সেইখানেই থাকিত। কিন্তু ছড়ার চাঁদকে ছড়ার লোকেরা মিথ্যা প্রলোভন দিতে সাহস করিত না—খোকার কপালে টী দিয়া

খাইবার জন্য নামিয়া আসা চাঁদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব তাহা তাহারা মনে করে নাই। সুতরাং ভাণ্ডারে যাহা মজুত আছে, তহবিলে যাহা কুলাইয়া উঠে—কবিত্বের উৎসাহে তাহার অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক কিছু স্বীকার করিয়া বসিতে পারিত না। আমাদের বাঙ্‌লা দেশের চাঁদামামা বাঙ্‌লাদেশের সহস্র কুটীর হইতে সুকণ্ঠের সহস্র নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া চুপিচুপি হাস্য করিত; হাঁ-ও বলিত না, না-ও বলিত না, এমন ভাব দেখাইত যেন কোন্ দিন, কাহাকেও কিছু সংবাদ না দিয়া, পূর্ব্বদিগন্তে যাত্রারম্ভ করিবার সময়, অম্‌নি পথের মধ্যে, কৌতুক-প্রফুল্ল পরিপূর্ণ হাস্যমুখখানি লইয়া ঘরের কানাচে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ছড়াগুলিকে একটি আস্তজগতের ভাঙা টুক্‌রা বলিয়া মনে হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখ দুঃখ শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দ্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখীদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল—অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দ্দম, পদচিহ্ন-রেখাসমেত, পাথর হইয়া গিয়াছে—সে-চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে; কেহ খোন্তা দিয়া খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই,—তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কতকালের এক-টুক্‌রা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্ত্তী বর্ত্ত-মানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে;—আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে।

"ও পারেতে কালো রঙ,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্,

এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে ॥"
"এ মাসটা থাক্‌, দিদি, কেঁদে ক'কিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাবো পাল্কী সাজিয়ে ॥"
"হাড় হ'লো ভাজা ভাজা, মাস হ'লো দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ॥"

এই অন্তর্ব্যথা এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রুজলোচ্ছ্বাস কোন্ কালে কোন্ গোপন গৃহকোণ হইতে কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নববধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল! এমন কত অসহ্য কষ্ট জগতে কোনো চিহ্ন না রাখিয়া অদৃশ্য দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো বায়ুস্রোতে বিলীন হইয়াছে। এটা কেমন করিয়া দৈবক্রমে শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে!

ওপারেতে কালো রঙ; বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌!

এমন দিনে এমন অবস্থায় মন-কেমন না করিয়া থাকিতে পারে না! চিরকালই এমনি হইয়া আসিতেছে! বহুপূর্বে উজ্জয়িনী রাজসভার মহাকবিও বলিয়া গিয়াছেন,—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
——— ———কিং পুনর্দূরসংস্থে।

কালিদাস যে-কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে—

"গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে!"
"হাড় হ'লো ভাজা ভাজা, মাস হ'লো দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি!"—

ইহার ভিতরকার সমস্ত মর্মান্তিক কাহিনী, সমস্ত দুর্বিসহ বেদনা-পরম্পরা কে বলিয়া দিবে! দিনে দিনে রাত্রে রাত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে কত

সহ্য করিতে হইয়াছিল—এমন সময়, সেই স্নেহস্মৃতিহীন সুখহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃগৃহের চিরপরিচিত সাধের দাদা ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে,—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে! সেই ঘরে সেই খেলা সেই বাপ-মা সেই সুখশৈশব সমস্ত মনে পড়িয়া আর কি এক দণ্ড দুরন্ত উতলা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখা যায়! সেদিন কিছুতে আর একটি মাসের প্রতীক্ষাও প্রাণে প্রাণে সহিতেছিল না—বিশেষত, সেদিন নদীর ওপার নিবিড় মেঘে কালো হইয়া আসিয়াছিল, বৃষ্টি ঝমঝম্ করিয়া পড়িতেছিল ইচ্ছা হইতেছিল বর্ষার বৃষ্টিধারামুখরিত, মেঘচ্ছায়াশ্যামল, কূলে কূলে পরিপূর্ণ অগাধ শীতল নদীটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এখনি হাতের ভিতরকার জ্বালাটা নিবাইয়া আসি!—ইহার মধ্যে একটি ব্যাকরণের ভুল আছে, সেটিকে বঙ্গভাষার সতর্ক অভিভাবকগণ মার্জনা করিবেন, এমন কি, তাহার উপরেও একবিন্দু অশ্রুপাত করিবেন! ভাইয়ের প্রতি "গুণবতী" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া উক্ত অজ্ঞাতনাম্নী কন্যাটি অপরিমেয় মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছিল! সে হতভাগিনী স্বপ্নেও জানিত না তাহার সেই একদিনের মর্মভেদী ক্রন্দনধ্বনির সহিত এই ব্যাকরণের ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে! জানিলে লজ্জায় মরিয়া যাইত!—হয় তো ভুলটি গুরুতর নহে; হয় তো ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কথাটা বলা হইতেছে এমনও হইতে পারে। সম্প্রতি যাঁহারা বঙ্গভাষার বিশুদ্ধিরক্ষার্থে কায়মন প্রাণ এবং পুরাতন সৌন্দর্যগুলিকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশত আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্যাকরণ লঙ্ঘনপূর্বক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন, এমন কি, পত্নীদেবীর সম্পর্কের দ্বারা প্রীতিপূর্ণ মাতৃসম্বোধন অভিহিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন না!

আমাদের বাংলা দেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি-পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালী কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ ঘরের দুঃখ, বাঙালীর গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালীর হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালীর অম্বিকা-পূজা এবং বাঙালীর কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাঙলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে আমাদের ছড়ার মধ্যেও বঙ্গজননীর এই মর্ম্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুর বাড়ি সংসার কাঁদিয়ে ?
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে।
সেই যে-মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে ॥
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে-বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজায়ে ॥
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁসেলে বসিয়ে।
সেই যে-মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে ॥
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই যে-পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে ॥
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে-ভাই কাপড় দিয়েছেন আল্‌না সাজিয়ে ॥
বোন্ কাঁদেন বোন্ কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
সেই যে-বোন্—

এইখানে, পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্ব্বে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে-ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন, তাহার পূর্ব্বব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভালো, তথাপি সাধারণত এরূপ কলহ নিত্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণরস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্ব্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে 'ভর্ত্তৃখাদিকা' বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম।

বোন্ কাঁদেন বোন্ কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
সেই যে-বোন্ গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী ব'লে॥

মা অলঙ্কার দিয়াছেন, বাপ অর্থ দিয়াছেন, মাসী ভাত খাওয়াইয়াছেন, পিসি দুধ খাওয়াইয়াছেন, ভাই কাপড় কিনিয়া দিয়াছেন; আশা করিয়াছিলাম এমন স্নেহের পরিবারে ভগিনীও অনুরূপ কোনো প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু হঠাৎ শেষ ছত্রটা পড়িয়াই বক্ষে একটা আঘাত লাগে এবং চক্ষুও ছল্‌ছল্ করিয়া উঠে। মা-বাপের পূর্ব্বতন স্নেহব্যবহারের সহিত বিদায়কালীন রোদনের একটা সামঞ্জস্য আছে—তাহা প্রত্যাশিত। কিন্তু যে-ভগিনী সর্ব্বদা ঝগড়া করিত এবং অকথ্য গালি দিত, বিদায়কালে তাহার কান্না যেন সবচেয়ে সকরুণ

হঠাৎ আজ বাহির হইয়া পড়িল যে, তাহার সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহের মাঝখানে একটি সুকোমল স্নেহ গোপনে সঞ্চিত হইতেছিল সেই অলক্ষিত স্নেহ সহসা সুতীব্র অনুশোচনার সহিত আজ তাহাকে বড়ো কঠিন আঘাত করিল। সে খাটের খুরা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্যকালে এই এক-খাটে তাহারা দুই ভগিনী শয়ন করিত, এই শয়নগৃহই তাহাদের সমস্ত কলহ বিবাদ এবং সমস্ত খেলাধূলার লীলাক্ষেত্র ছিল। বিচ্ছেদের দিনে এই শয়ন-ঘরে আসিয়া, এই খাটের খুরা ধরিয়া নির্জ্জনে গোপনে দাঁড়াইয়া ব্যথিত বালিকা যে ব্যাকুল অশ্রুপাত করিয়াছিল, সেই গভীর স্নেহ-উৎসের নির্ম্মল জলধারায় কলহভাষার সমস্ত কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া শুভ্র হইয়া গিয়াছে!

এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে একটি ছত্রে একটি কথায় সুখদুঃখের এক-একটি বড়ো বড়ো অধ্যায় উহ্য রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে যে-ছড়াটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার দুই ছত্রে আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কতদিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে!

দোল্ দোল্ দুলুনি।
রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আস্‌বে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি।
কেঁদে কেন মরো।
আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর করো॥

একটি শিশুকন্যাকেও দোল দিতে দিতে দূর ভবিষ্যৎবর্ত্তী বিচ্ছেদ সম্ভাবনা স্বতই মনে উদয় হয় এবং মায়ের চক্ষে জল আসে। তখন একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে, এমনি চিরদিন হইয়া আসিতেছে। তুমিও একদিন মাকে কাঁদাইয়া পরের ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলে,—আজিকার সংসার হইতে সেদিনকার নিদারুণ বিচ্ছেদের সেই ক্ষত-

বেদনার সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে ;—তোমার মেয়েও যথাকালে তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং সে দুঃখও বিশ্বজগতে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না !

পুঁটুর শ্বশুরবাড়ি-প্রয়াণের অনেক ছবি এবং অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সে-কথাটা সর্ব্বদাই মনে লাগিয়া আছে।

পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে ?
ঘরে আছে কুণো বেড়াল কোমর বেঁধেছে ॥
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চার মিন্‌সে কাহার দেব পাল্কী বহাতে ॥
সরু-ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
চারমাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে।
উড়্‌কি ধানের মুড়্‌কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে ॥

শেষ ছত্র দেখিলেই বিদিত হওয়া যায়, শাশুড়ি কিসে ভুলিবে এই পরম দুশ্চিন্তা তখনো সম্পূর্ণ ছিল। উক্ত উড়্‌কি-ধানের মুড়্‌কি দ্বারাই সেই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করা যাইত এ-কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে নিঃসন্দেহ এখনকার অনেক কন্যার মাতা সেই সত্যযুগের জন্য গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে আক্ষেপ করিবেন। এখনকার দিনে কন্যার শাশুড়িকে যে কী উপায়ে ভুলাইতে হয় কন্যার পিতা তাহা ইহজন্মেও ভুলিতে পারেন না।

কন্যার সহিত বিচ্ছেদ একমাত্র শোকের কারণ নহে, অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ, সেও একটা বিষম শেল। অথচ অনেক সময় জানিয়া-শুনিয়া মা-বাপ এবং আত্মীয়েরা স্বার্থ অথবা ধন অথবা কুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিরুপায় বালিকাকে অপাত্রে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সেই অন্যায়ের বেদনা সমাজ মাঝে মাঝে প্রকাশ করে। ছড়ায় তাহার

পরিচয় আছে। কিন্তু পাঠকদের এ-কথা মনে রাখিতে হইবে, যে, ছড়ার সকল কথাই ভাঙা-চোরা, হাসিতে কান্নাতে অদ্ভুতে মেশানো।

ডালিম গাছে পর্‌ভু নাচে।
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্দি বাজে॥
আই গো চিন্‌তে পার।
গোটা-দুই অন্ন বাড়॥
অন্নপূর্ণা দুধের সর।
কাল যাব গো পরের ঘর॥
পরের বেটা মাল্লে চড়।
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥
হেই খুড়ো, তোর পায়ে ধরি!
থুয়ে আয়গা মায়ের বাড়ি॥
মায়ে দিল সরু শাঁখা, বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিলে হুড়্‌কো ঠেঙা, চল্ শ্বশুরবাড়ি॥

তখন ইংরাজের আইন ছিল না। অর্থাৎ দাম্পত্য অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার পাহারাওয়ালার হাতে ছিল না। সুতরাং আত্মীয়গণকে উদ্যোগী হইয়া সেই কাজটা যথাসাধ্য সহজে এবং সংক্ষেপে সাধন করিতে হইত। কিন্তু হাল নিয়মেই হোক্ আর সাবেক নিয়মেই হোক্, নিতান্ত পাশব বলের দ্বারা অসহায়া কন্যাকে অযোগ্যের সহিত যোজনা—এত বড়ো অস্বাভাবিক বর্ব্বর নৃশংসতা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ।

বাপ-মায়ের অপরাধ সমাজ বিস্মৃত হইয়া আসে, কিন্তু বুড়ো বরটা তাহার চক্ষুশূল। সমাজ সুতীব্র বিদ্রূপের দ্বারা তাহার উপরেই মনের সমস্ত আক্রোশ মিটাইতে থাকে।

তালগাছ কাটম্ বোসের বাটম্ গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি কর্‌বো কি॥
টক্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম, কানে মদন-কড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি॥
চোখ খাওগো বাপ মা, চোখ খাওগো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক-খেগো বুড়ো॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গাল্‌বার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে॥

বৃদ্ধের এমন লাঞ্ছনা আর কী হইতে পারে!

এক্ষণে বঙ্গগৃহের যিনি সম্রাট,—যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রতাপে প্রবলতম সেই মহামহিম খোকা-খুকু বা খুকুনের কথাটা বলা বাকি আছে।

প্রাচীন ঋগ্বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষ্যে রচিত—আর, মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা খুকুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি।

প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। তাহা আপনার আদিম সরলতাগুণে মানব-রচনার সর্ব্বপ্রথম। সে এই উনবিংশ-শতাব্দীর বাষ্পলেশশূন্য তীব্র মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের মধ্যেও মানব-হৃদয়ের নবীন অরুণোদয়রাগ রক্ষা করিয়া আছে।

এই চির-পুরাতন নব-বেদের মধ্যে যে-স্নেহগাথা, যে-শিশুস্তবগুলি রহিয়াছে তাহার বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্য এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আর সীমা নাই। মুগ্ধহৃদয়া বন্দনাকারিণীগণ নব-নব স্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক খুকু-দেবতার কত মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,—সে কখনো পাখী, কখনো চাঁদ, কখনো মাণিক, কখনো ফুলের বন।

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কি ;
নিরলে বসিয়ে চাঁদের মুখ নিরখি ॥

ভালোবাসার মতো এমন সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আর কিছুই নাই। সে আরম্ভকাল হইতে এই সৃষ্টির আদি অন্তে অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি সৃষ্টির নিয়ম সমস্তই লঙ্ঘন করিতে চায়। সে যেন সৃষ্টির লৌহপিঞ্জরের মধ্যে আকাশের পাখী। শত সহস্রবার প্রতিষেধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, প্রতিঘাত পাইয়াও তাহার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না, যে সে অনায়াসেই নিয়ম না মানিয়া চলিতে পারে! সে মনে মনে জানে আমি উড়িতে পারি, এই জন্যই সে লোহার শলাকাগুলাকে বারম্বার ভুলিয়া যায়। ধনকে লইয়া বনকে যাইবার কোনো আবশ্যক নাই, ঘরে থাকিলে সকল পক্ষেই সুবিধা। অবশ্য বনে অনেকটা নিরালা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ নিজেই স্বীকার করিতেছে সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য্য দ্রব্যের অসদ্ভাব ঘটিতে পারে। কিন্তু তবু ভালোবাসা জোর করিয়া বলে, তোমরা কি মনে করো আমি পারি না! তাহার এই অসঙ্কোচ স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়া আমাদের মতো প্রবীণবুদ্ধি বিবেচক লোকেরও হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়, আমরা বলি, তাও তো বটে, কেনই বা না পারিবে! যদি কোনো সঙ্কীর্ণহৃদয় বস্তুজগৎ-বদ্ধ সংশয়ী জিজ্ঞাসা করে, খাইবে কী? সে তৎক্ষণাৎ অম্লানমুখে উত্তর দেয়—"নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।" শুনিবা-মাত্র আমরা মনে করি, ঠিক সঙ্গত উত্তরটি পাওয়া গেল! অন্যের মুখে যাহা ঘোরতর স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা, যাহা উন্মাদের অত্যুক্তি, ভালোবাসার মুখে তাহা অবিসম্বাদিত প্রামাণিক কথা।

ভালোবাসার আর একটি গুণ এই যে, সে এককে আর করিয়া দেয়, ভিন্ন পদার্থের প্রভেদ-সীমা মানিতে চাহে না। পাঠক পূর্ব্বেই তাহার

উদাহরণ পাইয়াছেন—দেখিয়াছেন একটা ছড়ায় কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া খোকাকে অনায়াসেই পক্ষীজাতীয়ের সামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোনো প্রাণীবিজ্ঞানবিৎ তাহাতে আপত্তি করিতে আসেন না। আবার পরমুহূর্ত্তেই খোকাকে যখন আকাশের চন্দ্রের অভেদ আত্মীয়রূপে বর্ণনা করা হয়, তখন কোনো জ্যোতির্ব্বিৎ তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভালোবাসার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায় যখন সে আড়ম্বরপূর্ব্বক যুক্তির অবতারণা করিয়া ঠিক শেষ মুহূর্ত্তে তাহাকে অবজ্ঞাভরে পদাঘাত করিয়া ভাঙিয়া ফেলে! নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

চাঁদ কোথা পাব বাছা যাদুমণি!
মাটির চাঁদ নয় গ'ড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব!
তুই চাঁদের শিরোমণি!
ঘুমোরে আমার খোকামণি!

চাঁদ আয়ত্তগম্য নহে, চাঁদ মাটির গড়া নহে, গাছের ফল নহে,—এ-সমস্তই বিশুদ্ধ যুক্তি, অকাট্য এবং নূতন—ইহার কোথাও কোনো ছিদ্র নাই। কিন্তু এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া অবশেষে যদি খোকাকে বলিতে হয় যে, তুমিই চাঁদ এবং তুমি সকল চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ, তবে তো মাটির চাঁদও সম্ভব, গাছের চাঁদও আশ্চর্য্য নহে! তবে গোড়ায় যুক্তির কথা পাড়িবার কী দরকার ছিল!

এইখানে বোধ করি একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায় তাহা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভালোবাসারই একাধিপত্য। ভালোবাসা স্বর্গের মানুষ। সে বলে আমার

অপেক্ষা আর কিছু কেন প্রধান হইবে? আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়াই বিশ্ব-নিয়মের সমস্ত বাধা কেন অপসারিত হইবে না? সে স্বপ্ন দেখিতেছে এখনো সে স্বর্গেই আছে। কিন্তু হায়, মর্ত্ত্য পৃথিবীতে স্বর্গের মতো ঘোরতর অযৌক্তিক পদার্থ আর কী হইতে পারে? তথাপি পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে, সে কেবল রমণীতে বালকে প্রেমিকে ভাবুকে মিলিয়া সমস্ত যুক্তি এবং নিয়মের প্রতিকূল স্রোতেও ধরাতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী যে পৃথিবীই, একথা তাহারা অনেক সময় ভুলিয়া যায় বলিয়াই সে ভ্রমক্রমেই পৃথিবীতে দেবলোক স্খলিত হইয়া পড়ে।

ভালোবাসা একদিকে যেমন প্রভেদ-সীমা লোপ করিয়া চাঁদে ফুলে খোকায় পাখীতে একমুহূর্ত্তে একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার আর একদিকে যেখানে সীমা নাই সেখানে সীমা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই সেখানে আকার গড়িয়া বসে।

এ পর্য্যন্ত কোনো প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ঘুমকে স্তন্যপায়ী অথবা অন্য কোনো জীবশ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই। কিন্তু ঘুম না কি খোকার চোখে আসিয়া থাকে এই জন্য তাহার উপরে সর্ব্বদাই ভালোবাসার সৃজন-হস্ত পড়িয়া সেও কখন্ একটা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে!

হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম পথে পথে ফেরে।
চার কড়া দিয়ে কিন্‌লেম ঘুম, মণির চোখে আয়রে॥

রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন তো আর হাটে ঘাটে লোক নাই। সেই জন্য সেই হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম নিরাশ্রয় হইয়া অন্ধকারে পথে পথে মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বোধ করি সেইজন্যই তাহাকে এত সুলভ মূল্যে পাওয়া গেল। নতুবা সমস্ত রাত্রির পক্ষে চার কড়া কড়ি এখনকার কালের মজুরীর তুলনায় নিতান্তই যৎসামান্য।

শুনা যায় গ্রীক কবিগণ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তও ঘুমকে স্বতন্ত্র

মানবীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু নৃত্যকে একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুরূপে গণ্য করা কেবল আমাদের ছড়ার মধ্যেই দেখা যায়।

থেনা নাচন্ থেনা।
বট পাকুড়ের ফেনা॥
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান।
সোনার যাদুর জন্মে যায়ে নাচ্না কিনে আন্॥

কেবল তাহাই নহে। খোকার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা সেও বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ বা অণু-বীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে, স্নেহবীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব।

হাতের নাচন, পায়ের নাচন, বাটা মুখের নাচন,
নাটা চক্ষের নাচন, কাঁটালি ভুরুর নাচন,
বাঁশির নাকের নাচন, মাজা বেঙ্কুর নাচন,
আর নাচন কী?
অনেক সাধন ক'রে যাদু পেয়েছি॥

ভালোবাসা কখনো অনেককে এক করিয়া দেখে, কখনো এককে অনেক করিয়া দেখে, কখনো বৃহৎকে তুচ্ছ এবং কখনো তুচ্ছকে বৃহৎ করিয়া তুলে। "নাচ্‌রে নাচ্‌রে, যাদু, নাচন্‌খানি দেখি!" নাচন্‌খানি! যেন যাদু হইতে তাহার নাচন্‌খানিকে পৃথক্ করিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থের মতো দেখা যায় ; যেন সেও একটি আদরের জিনিষ! "খোকা যাবে বেড়ু কর্‌তে তেলি-মাগিদের পাড়া।" এস্থলে 'বেড়ু কর্‌তে' না বলিয়া 'বেড়াইতে' বলিলেই প্রচলিত ভাষার গৌরব রক্ষা করা হইত, কিন্তু তাহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোর গৌরব হ্রাস হইত। পৃথিবীশুদ্ধ লোক বেড়াইতে থাকে, কিন্তু খোকাবাবু 'বেড়ু' করেন। উহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোটি একটু বিশেষ পদার্থরূপে প্রকাশ পায়।

খোকা এলো বেড়িয়ে।
দুধ দাও গো জুড়িয়ে॥
দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হলেন ক্ষ্যাপ্ত॥
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে॥

অবশ্য, খোকাবাবু ভ্রমণ সামাধা করিয়া আসিয়া দুধের বাটি দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন সে ঘটনাটি গৃহরাজ্যের মধ্যে একটি বিষম ঘটনা, এবং তাঁহার যে নৌকারোহণে ভ্রমণের সঙ্কল্প আছে ইহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য, কিন্তু পাঠকগণ শেষ ছত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজের দোকান হইতে আজানু-সমুত্থিত বুট্ কিনিয়া অত্যন্ত মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া বেড়াই, তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র! কিন্তু খোকা বাবুর অতি ক্ষুদ্র কোমল চরণযুগলে ছোট ঘুন্টী দেওয়া অতি ক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতাজোড়া, সেটা হইল জুতুয়া! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে জুতার আদরও অনেকটা পদ-সম্ভ্রমের উপরেই নির্ভর করে, তাহার অন্য মূল্য কাহারও খবরেই আসে না।

সর্ব্বশেষে, উপসংহার কালে আর একটি কথা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আছে। যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ, অকৃত্রিম প্রীতি সেইখানে তাহার দেবপূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালোবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি। ঐ যে বলা হইয়াছে "নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি," ইহা দেবতারই ধ্যান। শিশুর ক্ষুদ্রমুখখানির মধ্যে এমন কী আছে যাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য, যাহা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য অরণ্যের নিরালার মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা হয়, মনে হয়, সমস্ত সংসার সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক

ক্রিয়াকর্ম্ম এই আনন্দ-ভাণ্ডার হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে! যোগীগণ যে-অমৃত-লালসায় পানাহার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের অক্ষুব্ধ অবসর অন্বেষণ করিতেন, জননী নিজের সন্তানের মুখে সেই দেবদুর্ল্লভ অমৃতরসের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহার অন্তরের উপাসনা-মন্দির হইতে এই গাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—

ধনকে নিয়ে বনকে যাবো—সেখানে খাবো কী!
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

সেইজন্য ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশের মনুষ্যে দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম সম্বন্ধসকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয় এবং দেবত্বকেও আদর করা হয় না। আমাদের ছড়ার মধ্যে মর্ত্ত্যের শিশু স্বর্গের দেবপ্রতিমার সঙ্গে যখন-তখন এক হইয়া গিয়াছে—সেও অতি সহজে অবহেলে—তাহার জন্য স্বতন্ত্র চাল-চিত্রেরও আবশ্যক হইতেছে না। শিশু-দেবতার অতি অদ্ভুত অসঙ্গত অর্থহীন চালচিত্রের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কখন্ অলক্ষিতে শিশুর সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।

খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলি-মাগিদের পাড়া।
তেলি মাগিরা মুখ করেছে কেনরে মাখনচোরা॥
ভাঁড় ভেঙেছে, ননি খেয়েছে, আর কি দেখা পাব।
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশি কেড়ে নেব॥

হঠাৎ তেলি-মাগিদের পাড়ায় ক্ষুদ্র খোকাবাবু কখন যে বৃন্দাবনের বাঁশি আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা সে-বাঁশি যাহাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারিবে।

আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্ত্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো-করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে, এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা-বৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্ব্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা-গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে ; এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশু-মনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।

(১৩০১)

———

রাজসিংহ

রাজসিংহ প্রথম হইতে উল্‌টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে। এবং সেই অগ্রসর-গতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিতেছে।

এই অনিবার্য্য অগ্রসর-গতি সঞ্চার করিবার জন্য বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জ্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।

কোনো ভীরু লেখকের হাতে পড়িলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বড়ো বড়ো কৈফিয়ৎ বসিত। জবাবদিহির ভয়ে তাহাকে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিতে হইত। সম্রাটের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদশাহজাদীর সহিত মোবারকের প্রণয়ব্যাপার, তাহা লইয়া দুঃসাহসিকা আতরওয়ালী দরিয়ার প্রগল্‌ভতা, চঞ্চলকুমারীর নিকট আপন পরামর্শ ও পাঞ্জা-সমেত যোধপুরী বেগমের দূতীপ্রেরণ, সেনাপতির নিকট নৃত্যকৌশল দেখাইয়া দরিয়ার পুরুষবেশী অশ্বারোহী সৈনিক সাজিবার সম্মতি গ্রহণ—এ সমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে—কিন্তু ইহাদের সত্যকার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বঙ্কিম বাবু এক একটি ছোটো ছোটো পরিচ্ছেদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্রমে অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া গেছেন যে, কেহ তাঁহাকে সন্দেহ

করিতে সাহস করে না। ভীতু লেখকের কলম এই সকল জায়গায় ইতস্তত করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরো বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

বঙ্কিম বাবু একে তো কোথাও কোনোরূপ জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দ্দোষ পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মাণিকলাল যখন পথের মধ্যে হঠাৎ অপরিচিতা নির্ম্মলকুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া বসিতে বলিল এবং নির্ম্মল যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে মাণিকলালের অনুরোধ রক্ষা করিল,—তখন লেখক কোথায় তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবেন, তাহা না হইয়া উল্‌টাইয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন—

"বোধ হয় কোর্টশিপটা পাঠকের বড়ো ভালো লাগিল না। আমি কী করিব? ভালোবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—'হে প্রাণ!' 'হে প্রাণাধিকা!' সে-সব কিছুই নাই—ধিক্!"

এই গ্রন্থ-বর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রের, বিশেষত স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে, বড়ো একটা দ্রুততা আছে। তাহারা বড়ো বড়ো সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে, অথচ তৎপূর্ব্বে যথেষ্ট ইতস্তত অথবা চিন্তা করে না। সুন্দরী বিদ্যুৎরেখার মতো এক নিমেষে মেঘাবরোধ ছিন্ন করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোনো প্রস্তরভিত্তি সেই প্রলয়গতিকে বাধা দিতে পারে না।

স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এম্‌নি করিয়াই কজে করে। তাহার সমগ্র মনপ্রাণ লইয়া, বিবেচনা চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া, একেবারে অব্যবহিত ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে-হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার

প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্য্য বেগে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠককে পূর্ব্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। বঙ্কিম বাবু তাহা পূরাপূরি দেন নাই।

সেইজন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয়, সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয়, এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা সংশয়ভারে ভারাক্রান্ত, কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।

যাহারা আজকালকার ইংরেজি নভেল বেশি পড়ে তাহাদের কাছে এই লঘুতা বড়ো বিস্ময়জনক। আধুনিক ইংরাজি নভেলে পদে পদে বিশ্লেষণ—একটা সামান্যতম কার্য্যের সহিত তাহার দূরতম কারণপরম্পরা গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়। ব্যাপারটা হয় তো ছোটো, কিন্তু তাহার নথীটা বড়ো বিপর্য্যয়। আজকালকার নভেলিষ্ট্রা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর; এই জন্য উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।

এই জন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয় কর্ম্মক্লান্ত মানবহৃদয়ের পক্ষে বাস্তব জগতের চিন্তাভার অনেক সময় যথেষ্টর অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্দ্দয় হয় তবে আর পলায়নের পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

কিন্তু সত্যকে সম্যক প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালোরূপ অনুভবগম্য হইয়া

হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করে ; কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

বঙ্কিমবাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিগ্ধরূপে সম্ভবপর ও প্রশ্নসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলা ভঙ্গীতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় নাই।

এমন হইবার কারণও স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যখন বৃহৎ সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে চলে তখন তাহারা সমস্ত ঘর-করনা কাঁধে করিয়া লইয়া চলিতে পারে না। বিস্তর আবশ্যক দ্রব্যের মায়াও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়। চলৎশক্তির বাধা তাহাদের পক্ষে মারাত্মক। গৃহস্থ মানুষের পক্ষেই উপকরণের প্রাচুর্য্য এবং ভাববাহুল্য শোভা পায়।

রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো—ঘটনাগুলা বিচিত্র বূহ-রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। রাজসিংহের সহিত চঞ্চলকুমারীর প্রণয়ব্যাপারটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোনো কোনো পাঠক এবং সম্ভবত বহুসংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিম বাবু বড়ো একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন—এই সুযোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণরসের করুণবাণে দিগ্‌বিদিক সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সঙ্কীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিত-রবে ফেনাইয়া চলিতেছিল—তাহারই উপর দিয়া সামাল্ সামাল্ তরী! তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় করিবার সময় নহে।

তখনকার যে প্রেম, সে অত্যন্ত বাহুল্যবর্জ্জিত সংক্ষিপ্ত সংহত। সে তো বাসররাত্রের সুখশয্যার বাসন্তী প্রেম নহে—ঘন বর্ষার কালরাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে—মান অভিমান লাজ লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া ত্রস্ত নায়িকা চকিত বাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নাই।

এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিঙ্গন অনুভব করিতেছে। কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃপুরপ্রান্তে একটি বালিকা,—কালক্রমে সে কোন ক্ষুদ্র রাজপুত নৃপতির শত রাজ্ঞীর মধ্যে অন্যতমা হইয়া অসম্ভব-চিত্রিত লতার উপরে অসম্ভব-চিত্রিত পক্ষিখচিত শ্বেতপ্রস্তররচিত কক্ষপ্রাচীর মধ্যে পুরু গালিচায় বসিয়া রঙ্গসঙ্গিনীগণের হাসি-টিট্‌কারী-পরিবৃত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত, সেই পুষ্পপ্রতিমা সুকুমার সুন্দর বালিকাটুকুর মধ্যে কী এক দুর্ব্বার দুর্দ্ধর্ষ প্রাণশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল—সে আজ বাঁধ-মুক্ত বন্যার একটি গর্ব্বোদ্ধত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লীর সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজ-প্রাসাদের রত্নখচিত রঙ-মহলে সুন্দরী জেবউন্নিসা—সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আরামের পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল, সে-দিনের সেই মৃত্যু-দোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধরিল, সম্রাট-দুহিতাকে কে সেই সর্ব্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল যে-দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটীরবাসিনী কৃষক-কন্যার সহিত এক বেদনাশয্যায় শয়ান করাইয়া দেয়। দস্যু মাণিকলাল হইল বীর, রূপমুগ্ধ মোবারক মৃত্যুসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিল, গৃহ পিঞ্জরের নির্ম্মল কুমারী বিপ্লবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল, এবং নৃত্যকুশলা পতঙ্গ-

চপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল!

অর্দ্ধরাত্রির এই বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর জাগরণের মধ্যে কি মধ্যাহ্ন-কুলায়বাসী প্রণয়ের করুণ-কপোতকূজন প্রত্যাশা করা যায়?

রাজসিংহ দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষবৃক্ষের সুতীব্র সুখদুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল। অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। রাজসিংহের প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর সেরূপ রক্তবর্ণ সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না, তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্ত্র জাতীয় উপন্যাস।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম প্রথম খট্‌কা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়োই বেশি তাড়াতাড়ি দেখিতেছি—কাহারো যেন মিষ্ট মুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর একটু গভীরতররূপে কর্ষণ করিয়া গেলে ভালো হইত! যখন এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম তখন রাজসিংহের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করি নাই।

পর্ব্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মতো ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে,—মনে হয় না তাহারা কোনো কাজের। পৃথিবীতে তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছুদূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে—ক্রমেই গভীরতর হইয়া ক্রমে প্রশস্ততর হইয়া পর্ব্বত ভাঙিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া

মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। তাহার এক একটি খণ্ড একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি—তাহার পর ষষ্ঠখণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গম্ভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জ্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রু-নিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তি-বিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের এক যুগাবসান হইতে আর-এক যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ—উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেব্‌উন্নিসা।

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারী, মাণিকলাল প্রভৃতি ছোটো বড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘ-দুর্দ্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে, তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাহাদের জীবন ইতিহাসের, তাহাদের সুখদুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই—অর্থাৎ এ-গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

জেব্‌উন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ-গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে, কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে

গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই, সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানব-জীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখ, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্ম্মান্তিক আর্ত্তধ্বনিও—রথের চূড়া যে-গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে—সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয় তো সেই রথচূড়াকেও ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিম বাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

তিনি এই বৃহৎ জাতীয়-ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

মোগল সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে, সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, প্রজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেব্‌উন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাটদুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্ম্মের মস্তকে আপন জরি-জহরৎ-জড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল, তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্ম্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখমন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে

সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেব্‌উন্নিসা সম্রাট্-প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎবাসিনী-রমণী।

ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম-অংশে বড়ো একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্য্যোগের রাত্রে একদিকে মোগলের অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর এক দিকে সর্ব্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে; সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবে—কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাস-পর্য্যায়কে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি এই ধূলি-লুণ্ঠ্যমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনা-বহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্ত্তী না হয় এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুই একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই জন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত

ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশি করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোনো কোনো অতিকৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তর-ভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র এবং সেই জন্য মনক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, লেখক গ্রন্থবিশেষে কী করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসঙ্গত নহে। গ্রন্থ-পাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।

(১৩০০)

পঞ্চভূত

কাব্যের তাৎপর্য্য

স্রোতস্বিনী আমাকে কহিলেন, কচ-দেবযানী-সংবাদ সম্বন্ধে তুমি যে কবিতা লিখিয়াছ তাহা তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।

শুনিয়া আমি মনে মনে কিঞ্চিৎ গর্ব্ব অনুভব করিলাম, কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন তখন সজাগ ছিলেন, তাই দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি রাগ করিয়ো না, সে-কবিতার কোনো তাৎপর্য্য কিম্বা উদ্দেশ্য আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ও লেখাটা ভালো হয় নাই।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম! মনে মনে কহিলাম, আর একটু বিনয়ের সহিত মত প্রকাশ করিলে সংসারের বিশেষ ক্ষতি অথবা সত্যের বিশেষ অপলাপ হইত না; কারণ, লেখার দোষ থাকাও যেমন আশ্চর্য্য নহে তেমনি পাঠকের কাব্যবোধশক্তির খর্ব্বতাও নিতান্তই অসম্ভব বলিতে পারি না। মুখে বলিলাম, যদিও নিজের রচনা সম্বন্ধে লেখকের মনে অনেক সময়ে অসন্দিগ্ধ মত থাকে তথাপি তাহা যে ভ্রান্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ আছে—অপর পক্ষে সমালোচক সম্প্রদায়ও যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে ইতিহাসে সে-প্রমাণেরও কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। অতএব কেবল এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আমার এ লেখা ঠিক তোমার মনের মতো হয় নাই; সে নিশ্চয় আমার দুর্ভাগ্য—হয় তো তোমার দুর্ভাগ্যও হইতে পারে।

দীপ্তি গম্ভীরমুখে অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিলেন—"তা হইবে!"—বলিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার পরে স্রোতস্বিনী আমাকে সেই কবিতা পড়িবার জন্য আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন না।

ব্যোম জানালার বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যেন সুদূর আকাশতলবর্ত্তী কোনো এক কাল্পনিক পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল —"যদি তাৎপর্য্যের কথা বলো, তোমার এবারকার কবিতার আমি একটা তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি।"

ক্ষিতি কহিল—"আগে বিষয়টা কী বলো দেখি? কবিতাটা পড়া হয় নাই সে কথাটা কবিবরের ভয়ে এতক্ষণ গোপন করিয়াছিলাম, এখন ফাঁস করিতে হইল।"

ব্যোম কহিল—"শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ নৃত্যগীতবাদ্যদ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আসক্তিসত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুখানি অনৈক্য আছে, কিন্তু সে সামান্য।"

ক্ষিতি কিঞ্চিৎ কাতরমুখে কহিল—"গল্পটি বারো হাত কাঁকুড়ের অপেক্ষা বড়ো হইবে না, কিন্তু আশঙ্কা করিতেছি ইহা হইতে তেরো হাত পরিমাণের তাৎপর্য্য বাহির হইয়া পড়িবে।"

ব্যোম ক্ষিতির কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া গেল—কথাটা দেহ এবং আত্মা লইয়া।

শুনিয়া সকলেই সশঙ্ক হইয়া উঠিল।

ক্ষিতি কহিল—"আমি এইবেলা আমার দেহ এবং আত্মা লইয়া মানে মানে বিদায় হইলাম।"

সমীর দুই হাতে তাহার জামা ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া কহিল, "সঙ্কটের সময় আমাদিগকে একলা ফেলিয়া যাও কোথায়?"

ব্যোম কহিল—"জীব স্বর্গ হইতে এই সংসারাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ হইতে শিক্ষা লাভ করে। যতদিন ছাত্র অবস্থায় থাকে, ততদিন তাহাকে এই আশ্রমকন্যা দেহটার মন জোগাইয়া চলিতে হয়। মন যোগাইবার অপূর্ব্ব বিদ্যা সে জানে। দেহে ইন্দ্রিয়-বীণায় সে এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত বাজাইতে থাকে যে ধরাতলে সৌন্দর্য্যের নন্দন-মরীচিকা বিস্তারিত হইয়া যায় এবং সমুদয় শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ আপন জড়শক্তির যন্ত্রনিয়ম পরিহারপূর্ব্বক অপরূপ স্বর্গীয় নৃত্যে স্পন্দিত হইতে থাকে।"

বলিতে বলিতে স্বপ্নাবিষ্ট শূন্যদৃষ্টি ব্যোম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল,—চৌকিতে সরল হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল—"যদি এমনভাবে দেখো, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা অনন্তকালীন প্রেমাভিনয় দেখিতে পাইবে। জীব তাহার মূঢ় অবোধ নির্ভর-পরায়ণা সঙ্গিনীটিকে কেমন করিয়া পাগল করিতেছে দেখো! দেহের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে, দেহধর্ম্মের দ্বারা যে-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে-সৌন্দর্য্য আনিয়া দিতেছে দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না—তাই সে বলিতেছে "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল";—তাহার কর্ণে যে-সঙ্গীত আনিয়া দিতেছে শ্রবণ-শক্তির দ্বারা তাহা আয়ত্ত হইতে পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে,—"সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ শ্রুতি-পথে পরশ না গেল!" আমার এই প্রাণ-প্রদীপ্ত মূঢ় সঙ্গিনীটিও লতার

ন্যায় সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রেম-প্রতপ্ত সুকোমল আলিঙ্গন-পাশে জীবকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরে, অল্পে অল্পে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া আনে, অশ্রান্ত যত্নে ছায়ার মতো সঙ্গে থাকিয়া বিবিধ উপচারে তাহার সেবা করে, প্রবাসকে যাহাতে প্রবাস জ্ঞান না হয় যাহাতে আতিথ্যের ত্রুটি না হইতে পারে সেজন্য সর্ব্বদাই সে তাহার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদকে সতর্ক করিয়া রাখে। এত ভালোবাসার পরে তবু একদিন জীব এই চিরানুগতা অনন্যাসক্তা দেহলতাকে ধূলিশায়িনী করিয়া দিয়া চলিয়া যায়! বলে,—প্রিয়ে, তোমাকে আমি আত্মনির্ব্বিশেষে ভালোবাসি, তবু আমি কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাসমাত্র ফেলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব! কায়া তখন তাহার চরণ জড়াইয়া বলে—বন্ধু, অবশেষে আজ যদি আমাকে ধূলিতলে ধূলিমুষ্টির মতো ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, তবে এতদিন তোমার প্রেমে কেন আমাকে এমন মহিমাশালিনী করিয়া তুলিয়াছিলে? হায়, আমি তোমার যোগ্য নই—কিন্তু তুমি কেন আমার এই প্রাণপ্রদীপ-দীপ্ত নিভৃত সোনার মন্দিরে একদা রহস্যান্ধকার-নিশীথে অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া অভিসারে আসিয়াছিলে? আমার কোন্ গুণে তোমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল?—এই করুণ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া এই বিদেশী কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহ জানে না। সেই আজন্মমিলনবন্ধনের অবসান, সেই মথুরযাত্রার বিদায়ের দিন, সেই কায়ার সহিত কায়াধিরাজের শেষ সম্ভাষণ—তাহার মতো এমন শোচনীয় বিরহ-দৃশ্য কোন্ প্রেমকাব্যে বর্ণিত আছে?"

ক্ষিতির মুখভাব হইতে একটা আসন্ন পরিহাসের আশঙ্কা করিয়া ব্যোম কহিল—"তোমরা ইহাকে প্রেম বলিয়া মনে করো না; মনে করিতেছ আমি কেবল রূপক অবলম্বনে কথা কহিতেছি! তাহা নহে। জগতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রেম এবং জীবনের সর্ব্বপ্রথম প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা যেমন প্রবল হইয়া থাকে, জগতের সর্ব্বপ্রথম প্রেমও সেইরূপ সরল

অথচ সেইরূপ প্রবল। এই আদি প্রেম এই দেহের ভালোবাসা যখন সংসারে দেখা দিয়াছিল তখনও পৃথিবীতে জলে স্থলে বিভাগ হয় নাই—সে দিন কোনো কবি উপস্থিত ছিল না, কোনো ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করে নাই—কিন্তু সেই দিন এই জলময় পঙ্কময় অপরিণত ধরাতলে প্রথম ঘোষিত হইল, যে এ জগৎ যন্ত্রজগৎমাত্র নহে ;—প্রেম নামক এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজ বন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন—এবং সেই পঙ্কজ-বনের উপরে আজ ভক্তের চক্ষে সৌন্দর্য্যরূপা লক্ষ্মী এবং ভাবরূপা সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইয়াছে।

ক্ষিতি কহিল—"আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে এমন একটা বৃহৎ কাব্য কাণ্ড চলিতেছে শুনিয়া পুলকিত হইলাম—কিন্তু সরলা কায়াটির প্রতি চঞ্চলস্বভাব আত্মাটার ব্যবহার সন্তোষজনক নহে ; ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি একান্ত মনে আশা করি যেন আমার জীবাত্মা এরূপ চপলতা প্রকাশ না করিয়া অন্তত কিছু দীর্ঘকাল দেহ দেবযানীর আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করে। তোমরাও সেই আশীর্ব্বাদ করো।"

ব্যোম চৌকিতে ঠেসান দিয়া বসিয়া জানালার উপর দুই পা তুলিয়া দিল। ক্ষিতি কহিল—"যদি অবসর পাই তবে আমিও একটা তাৎপর্য্য শুনাইতে পারি। আমি দেখিতেছি 'এভোল্যুশন্ থিয়রি' অর্থাৎ অভিব্যক্তিবাদের মোট কথাটা এই কবিতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সঞ্জীবনী বিদ্যাটার অর্থ, বাঁচিয়া থাকিবার বিদ্যা। সংসারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে একটা লোক সেই বিদ্যাটা অহরহ অভ্যাস করিতেছে—সহস্র বৎসর কেন, লক্ষ সহস্র বৎসর ধরিয়া। কিন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া সে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতেছে সেই প্রাণীবংশের প্রতি তাহার কেবল ক্ষণিক প্রেম দেখা যায়। যেই একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া যায়, অমনি নিষ্ঠুর প্রেমিক চঞ্চল অতিথি তাহাকে অকাতরে ধ্বংসের মুখে

ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। পৃথিবীর স্তরে স্তরে এই নির্দ্দয় বিদায়ের বিলাপগান প্রস্তরপটে অঙ্কিত রহিয়াছে—"

দীপ্তি ক্ষিতির কথা শেষ না হইতে হইতেই বিরক্ত হইয়া কহিল—"তোমরা এমন করিয়া যদি তাৎপর্য্য বাহির করিতে থাকো তাহা হইলে তাৎপর্য্যের সীমা থাকে না। কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া দিয়া অগ্নির বিদায় গ্রহণ, গুটী কাটিয়া ফেলিয়া প্রজাপতির পলায়ন, ফুলকে বিশীর্ণ করিয়া ফলের বহিরাগমন, বীজকে বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের উদ্গম, এমন রাশি রাশি তাৎপর্য্য স্তূপাকার করা যাইতে পারে।"

ব্যোম গভীরভাবে কহিতে লাগিল, "ঠিক বটে। ও-গুলা তাৎপর্য্য নহে, দৃষ্টান্ত মাত্র। উহাদের ভিতরকার আসল কথাটা এই, সংসারে আমরা অন্তত দুই পা ব্যবহার না করিয়া চলিতে পারি না। বাম পদ যখন পশ্চাতে আবদ্ধ থাকে দক্ষিণপদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যায়, আবার দক্ষিণ পদ সম্মুখে হইতে আবদ্ধ হইলে পর বাম পদ আপন বন্ধন ছেদন করিয়া অগ্রে ধাবিত হয়। আমরা একবার করিয়া আপনাকে বাঁধি, আবার পরক্ষণেই সেই বন্ধন ছেদন করি। আমাদিগকে ভালোবাসিতেও হইবে এবং সে ভালোবাসা কাটিতেও হইবে,—সংসারের এই মহত্তম দুঃখ, এবং মহৎ দুঃখের মধ্য-দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। সমাজ সম্বন্ধেও একথা খাটে ;—নূতন নিয়ম কালক্রমে প্রাচীন প্রথারূপে আমাদিগকে একস্থানে আবদ্ধ করে, তখন সমাজবিপ্লব আসিয়া তাহাকে উৎপাটনপূর্ব্বক আমাদিগকে মুক্তি দান করে। যে-পা ফেলি সে-পা পরক্ষণে তুলিয়া লইতে হয় নতুবা চলা হয় না—অতএব অগ্রসর হওয়ার মধ্যে পদে পদে বিচ্ছেদবেদনা—ইহা বিধাতার বিধান।"

সমীর কহিল—"গল্পটার সর্ব্বশেষে যে একটি অভিশাপ আছে তোমরা কেহ সেটার উল্লেখ করো নাই। কচ যখন বিদ্যা লাভ করিয়া দেবযানীর প্রেমবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া যাত্রা করেন তখন দেবযানী তাঁহাকে অভিশাপ

দিলেন যে—তুমি যে-বিদ্যা শিক্ষা করিলে সে-বিদ্যা অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিবে কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না ;—আমি সেই অভিশাপ-সমেত একটা তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছি যদি ধৈর্য্য থাকে তো বলি।”

ক্ষিতি কহিল—“ধৈর্য্য থাকিবে কি না পূর্ব্বে হইতে বলিতে পারি না, প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইতেও পারে। তুমি তো আরম্ভ করিয়া দাও, শেষে যদি অবস্থা বুঝিয়া তোমার দয়ার সঞ্চার হয় থামিয়া গেলেই হইবে।”

সমীর কহিল—“ভালো করিয়া জীবন ধারণ করিবার বিদ্যাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা বলা যাক্। মনে করা যাক কোনো কবি সেই বিদ্যা নিজে শিখিয়া অন্যকে দান করিবার জন্য জগতে আসিয়াছে। সে তাহার সহজ স্বর্গীয় ক্ষমতায় সংসারকে বিমুগ্ধ করিয়া সংসারের কাছ হইতে সেই বিদ্যা উদ্ধার করিয়া লইল। সে-যে সংসারকে ভালোবাসিল না তাহা নহে ; কিন্তু সংসার যখন তাহাকে বলিল, তুমি আমার বন্ধনে ধরা দাও,—সে কহিল, ধরা যদি দিই, তোমার আবর্ত্তের মধ্যে যদি আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে এ সঞ্জীবনী বিদ্যা আমি শিখাইতে পারিব না ; সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। তখন সংসার তাহাকে অভিশাপ দিল—তুমি যে-বিদ্যা আমার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছ সে-বিদ্যা অন্যকে দান করিতে পারিবে, কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না।—সংসারের এই অভিশাপ থাকাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে গুরুর শিক্ষা ছাত্রের কাজে লাগিতেছে, কিন্তু সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপটু। তাহার কারণ, নির্লিপ্তভাবে বাহির হইতে বিদ্যা শিখিলে বিদ্যাটা ভালো করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা কাজের মধ্যে লিপ্ত হইয়া না থাকিলে তাহার প্রয়োগ শিক্ষা হয় না।

তোমরা যে-সকল কথা তুলিয়াছিলে সেগুলা বড় বেশি সাধারণ কথা। মনে করো যদি বলা যায়, রামায়ণের তাৎপর্য্য এই যে, রাজার গৃহে জন্মিয়াও অনেকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা শকুন্তলার তাৎপর্য্য এই যে, উপযুক্ত অবসরে স্ত্রী-পুরুষের চিত্তে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে ; তবে সেটাকে একটা নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্ত্তা বলা যায় না।"

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া কহিল—"আমার তো মনে হয় সেই সকল সাধারণ কথাই কবিতার কথা। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমৃত্যুকাল অসীম দুঃখ রাম ও সীতাকে সঙ্কট হইতে সঙ্কটান্তরে ব্যাধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে ; সংসারে এই অত্যন্ত সম্ভবপর, মানবাদৃষ্টের এই অত্যন্ত পুরাতন দুঃখকাহিনীতেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট এবং আর্দ্র হইয়াছে। শকুন্তলার প্রেমদৃশ্যের মধ্যে বাস্তবিকই কোনো নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্ত্তা নাই, কেবল এই নিরতিশয় প্রাচীন এবং সাধারণ কথাটি আছে যে শুভ অথবা অশুভ অবসরে প্রেম অলক্ষিতে অনিবার্য্যবেগে আসিয়া দৃঢ়বন্ধনে স্ত্রী-পুরুষের হৃদয় এক করিয়া দেয়। এই অত্যন্ত সাধারণ কথা থাকাতেই সর্ব্বসাধারণে উহার রসভোগ করিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বিশেষ অর্থ এই যে, মৃত্যু এই জীব জন্তু-তরু-লতা-তৃণাচ্ছাদিত বসুমতীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে কোনোকালে তাহার বসনাঞ্চলের অন্ত হইতেছে না, চিরদিনই সে প্রাণময় সৌন্দর্য্যময় নববস্ত্রে ভূষিত থাকিতেছে। কিন্তু সভাপর্ব্বে যেখানে আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবশেষে সঙ্কটাপন্ন ভক্তের প্রতি দেবতার কৃপায় দুই চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়াছিল, সে কি এই নূতন এবং বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া? না, অত্যাচারপীড়িত রমণীর লজ্জা ও সেই লজ্জানিবারণ নামক অত্যন্ত

সাধারণ, স্বাভাবিক এবং পুরাতন কথায়? কচ-দেবযানী-সংবাদেও মানব-হৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।"

সমীর হাসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আমাদিগকে কাব্যরসের অধিকারসীমা হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দিলেন; এক্ষণে স্বয়ং কবি কী বিচার করেন একবার শুনা যাক।"

স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বারম্বার এই অপবাদের প্রতিবাদ করিলেন।

আমি কহিলাম,—"এই পর্যন্ত বলিতে পারি যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড়ো নিরর্থক হয় নাই, অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচনাশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিয়া থাকে। এ যেন আতসবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহ বা হাউয়ের মতো একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা তুবড়ির মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহ বা বোমার মতো আওয়াজ করিতে থাকে। তথাপি মোটের উপর শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর সহিত আমার মত-বিরোধ দেখিতেছি না। অনেকে বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁটি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোনো কাব্যের মধ্যে যদি কোনো বিশেষ শিক্ষা থাকে,

তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহ সহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন, আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্ব্বক দেওয়া যায় না। কুসুমফুল হইতে কেহ বা তাহার রঙ বাহির করে, কেহ বা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয়-জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন,—আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারো সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না,—বিরোধে ফলও নাই।"

মনুষ্য

স্রোতস্বিনী প্রাতঃকালে আমার বৃহৎ খাতাটি হাতে করিয়া আনিয়া কহিল—"এ সব তুমি কী লিখিয়াছ? আমি যে-সকল কথা কস্মিন্‌কালে বলি নাই তুমি আমার মুখে কেন বসাইয়াছ?"

আমি কহিলাম, "তাহাতে কী দোষ হইয়াছে?"

স্রোতস্বিনী কহিল—"এমন করিয়া আমি কখনো কথা কহি না এবং কহিতে পারি না। যদি তুমি আমার মুখে এমন কথা দিতে, যাহা আমি বলি বা না বলি আমার পক্ষে বলা সম্ভব, তাহা হইলে আমি এমন লজ্জিত হইতাম না। কিন্তু এ যেন তুমি একখানা বই লিখিয়া আমার নামে চালাইতেছ।"

আমি কহিলাম—"তুমি আমাদের কাছে কতটা বলিয়াছ তাহা তুমি কী করিয়া বুঝিবে? তুমি যতটা বলো, তাহার সহিত তোমাকে যতটা জানি, দুই মিশিয়া অনেকখানি হইয়া উঠে। তোমার সমস্ত জীবনের দ্বারা তোমার কথাগুলি ভরিয়া উঠে। তোমার সেই অব্যক্ত উহ্য কথাগুলি তো বাদ দিতে পারি না।"

স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া রহিল। জানি না, বুঝিল কি না বুঝিল। বোধ হয় বুঝিল, কিন্তু তথাপি আবার কহিলাম—"তুমি জীবন্ত বর্ত্তমান, প্রতিক্ষণে নব নব ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছ—তুমি যে আছ, তুমি যে সত্য, তুমি যে সুন্দর, এ বিশ্বাস উদ্রেক করিবার জন্য তোমাকে কোনো চেষ্টাই করিতে হইতেছে না। কিন্তু লেখায় সেই প্রথম সত্যটুকু প্রমাণ করাইবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন এবং অনেক বাক্য ব্যয় করিতে হয়। নতুবা প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষ সক্ষমতা রক্ষা

করিতে পারিবে কেন? তুমি যে মনে করিতেছ আমি তোমাকে বেশি বলাইয়াছি তাহা ঠিক নহে—আমি বরং তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি—তোমার লক্ষ লক্ষ কথা, লক্ষ লক্ষ কাজ, চিত্র-বিচিত্র আকার-ইঙ্গিতের কেবল মাত্র সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে। নহিলে, তুমি যে-কথাটি আমার কাছে বলিয়াছ ঠিক সেই কথাটি আমি আর কাহারো কর্ণগোচর করাইতে পারিতাম না—লোকে ঢের কম শুনিত এবং ভুল শুনিত।"

স্রোতস্বিনী দক্ষিণ পার্শ্বে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া একটা বহি খুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল—"তুমি আমাকে স্নেহ করো বলিয়া আমাকে যতখানি দেখো আমি তো বাস্তবিক ততখানি নহি।"

আমি কহিলাম—"আমার কি এত স্নেহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক যতখানি আমি তোমাকে ততখানি দেখিতে পাইব? একটি মানুষের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে, ঈশ্বরের মতো কাহার স্নেহ!"

ক্ষিতি তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল,—"এ আবার তুমি কী কথা তুলিলে? স্রোতস্বিনী তোমাকে এক ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আর একভাবে তাহার উত্তর দিলে।"

আমি কহিলাম—"আমি বলিতেছিলাম, যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া

শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।

সমীর এতক্ষণ আমার খাতাটি পড়িতেছিল, শেষ করিয়া কহিল, "এ কী করিয়াছ? তোমার ডায়ারির এই লোকগুলা কি মানুষ, না যথার্থই ভূত? ইহারা দেখিতেছি কেবল বড়ো বড়ো ভালো ভালো কথাই বলে, কিন্তু ইহাদের আকার আয়তন কোথায় গেল?"

আমি বিমর্ষমুখে কহিলাম—"কেন বলো দেখি?"

সমীর কহিল—"তুমি মনে করিয়াছ, আমের অপেক্ষা আমসত্ত্ব ভালো—তাহাতে সমস্ত আঁঠি আঁশ আবরণ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়—কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, এবং সেই শোভন আকার কোথায়? তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল? আমার বেবাক বাজে কথাগুলো তুমি বাজেয়াপ্ত করিয়া যে একটি নিরেট মূর্তি দাঁড় করাইয়াছ তাহাকে দন্তস্ফুট করা দুঃসাধ্য। আমি কেবল দুই চারিটি চিন্তাশীল লোকের কাছে বাহবা পাইতে চাহি না, আমি সাধারণ লোকের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি।"

আমি কহিলাম—"সে জন্য কী করিতে হইবে?"

সমীর কহিল—"সে আমি কী জানি! আমি কেবল আপত্তি জানাইয়া রাখিলাম। আমার যেমন সার আছে তেমনি আমার স্বাদ আছে; সারাংশ মানুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু স্বাদ মানুষের নিকট প্রিয়। আমাকে উপলক্ষ করিয়া মানুষ কতকগুলো

মত কিম্বা তর্ক আহরণ করিবে এমন ইচ্ছা করি না, আমি চাই মানুষ আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে। এই ভ্রম-সঙ্কুল সাধের মানবজন্ম ত্যাগ করিয়া একটা মাসিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বই নই, তর্কের সুযুক্তি অথবা কুযুক্তি নই, আমার বন্ধুরা, আমার আত্মীয়েরা আমাকে সর্ব্বদা যাহা বলিয়া জানেন, আমি তাহাই।"

সমীর বলিয়া যাইতে লাগিল—"তরুণ বয়সে সংসারে মানুষ চোখে পড়িত না; মনে হইত যথার্থ মানুষগুলা উপন্যাস নাটক এবং মহাকাব্যেই আশ্রয় লইয়াছে, সংসারে কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন দেখিতে পাই লোকালয়ে মানুষ ঢের আছে, কিন্তু "ভোলা মন ও ভোলা মন, মানুষ কেন চিন্‌লি না!" ভোলা মন, এই সংসারের মাঝখানে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ্, এই মানবহৃদয়ের ভীড়ের মধ্যে! সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না, সেখানে তাহারা কথা কহিবে, লোকসমাজে যাহারা একপ্রান্তে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইবে, পৃথিবীতে যাহাদিগকে অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখিব তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিস্মৃত আত্মবিসর্জ্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন মহাকাব্যের নায়ক, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজাতি আছে, সেই আত্মীয়তা কোন্ নব দ্বৈপায়ন আবিষ্কার করিবে এবং প্রকাশ করিবে!"

আমি কহিলাম—"না করিলে কী এমন আসে যায়! মানুষ পরস্পরকে না যদি চিনিবে তবে পরস্পরকে এত ভালোবাসে কী করিয়া। একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ হইতে বহুদূরে

দু-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মুহুরীগিরি করিত। আমি তাহার প্রভু ছিলাম, কিন্তু প্রায় তাহার অস্তিত্বও অবগত ছিলাম না—সে এত সামান্য লোক ছিল! একদিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা হইল। আমার শয়নগৃহ হইতে শুনিতে পাইলাম সে "পিসিমা" "পিসিমা" করিয়া কাতরস্বরে কাঁদিতেছে। তখন সহসা তাহার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতখানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল! সেই যে একটি অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্ব্বোধ লোক বসিয়া বসিয়া ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া এক মনে নকল করিয়া যাইত তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান বৈধব্যের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তদেহে শূন্য বাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যতক্ষণ অন্ন টগবগ করিয়া না ফুটিয়া উঠিত ততক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে কি সেই দূরকুটীরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা ভাবিত না? একদিন যে তাহার নকলে ভুল হইল, ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতন কর্ম্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সেদিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পীড়ার সংবাদ পায় নাই? এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঙ্গল-বার্ত্তার জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল! এই দরিদ্র যুবকের প্রবাস-বাসের সহিত কি কম করুণ কাতরতা উদ্বেগজড়িত হইয়া ছিল! সহসা সেই রাত্রে এই নির্ব্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকটে দীপ্যমান হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিলাম, কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না—আমার সেই ঠিকা মহুরির মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন খুব মহৎ, তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোনো কবি অনুমান করে নাই, কোনো পাঠক স্বীকার

করে নাই, তাই বলিয়া সে-মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না—একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল—কিন্তু খোরাক-পোষাক সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারোমাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে আর আমাদের মতো দীপ্তিহীন ছোটো ছোটো লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়;—পিসিমার ভালোবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায় মানুষে পরিপূর্ণ।"

স্রোতস্বিনী দয়াস্নিগ্ধ মুখে কহিল—"তোমার ঐ বিদেশী মুহুরির কথা তোমার কাছে পূর্ব্বে শুনিয়াছি। জানি না, উহার কথা শুনিয়া কেন আমাদের হিন্দুস্থানী বেহারা নীহরকে মনে পড়ে। সম্প্রতি দুটি শিশু-সন্তান রাখিয়া তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে এখনো সে কাজকর্ম্ম করে, দুপুরবেলা বসিয়া পাখা টানে, কিন্তু এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে! তাহাকে যখনই দেখি কষ্ট হয়—কিন্তু সে-কষ্ট যেন ইহার একলার জন্য নহে—আমি ঠিক বুঝাইতে পারি না, কিন্তু মনে হয় যেন সমস্ত মানবের জন্য একটা বেদনা অনুভূত হইতে থাকে।"

আমি কহিলাম—"তাহার কারণ, সমস্ত মানুষই ভালোবাসে এবং বিরহ বিচ্ছেদ মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত ও ভীত। তোমার ঐ পাখাওয়ালা ভৃত্যের আনন্দহারা বিষণ্ণমুখে সমস্ত পৃথিবীবাসী মানুষের বিষাদ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।"

স্রোতস্বিনী কহিল—"কেবল তাহাই নয়। মনে হয় পৃথিবীতে যত দুঃখ তত দয়া কোথায় আছে? কত দুঃখ আছে যেখানে মানুষের সান্ত্বনা কোনোকালে প্রবেশও করে না, অথচ কত জায়গা আছে যেখানে ভালোবাসার অনাবশ্যক অতিবৃষ্টি হইয়া যায়। যখন দেখি আমার ঐ

বেহারা ধৈর্য্যসহকারে মূকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে, ছেলে দুটো উঠানে গড়াইতেছে, পড়িয়া গিয়া চীৎকারপূর্ব্বক কাঁদিয়া উঠিতেছে, বাপ মুখ ফিরাইয়া কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছে, পাখা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে পারিতেছে না; জীবনে আনন্দ অল্প অথচ পেটের জ্বালা কম নহে; জীবনে যত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটুক, দুই মুষ্টি অন্নের জন্য নিয়মিত কাজ চালাইতেই হইবে, কোনো ত্রুটি হইলে কেহ মাপ করিবে না—যখন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আছে যাহাদের দুঃখ কষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত; যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, স্নেহ দিই না, সান্ত্বনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না, তখন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর। কিন্তু সেই অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালোবাসে এবং ভালো-বাসার যোগ্য। আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালোরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি, নিজেকেও ভালোরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধ-ভাবে সুখদুঃখবেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলোক নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্ত্তব্য।"

ক্ষিতি কহিল—"পূর্ব্বকালে এক সময়ে সকল বিষয়ে প্রবলতার আদর কিছু অধিক ছিল। তখন মনুষ্যসমাজ অনেকটা অসহায় অরক্ষিত ছিল; যে প্রতিভাশালী, যে ক্ষমতাশালী সেইই তখনকার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইত। এখন সভ্যতার সুশাসনে সুশৃঙ্খলায় বিঘ্ন-বিপদ দূর হইয়া প্রবলতার অত্যধিক মর্য্যাদা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন অকৃতী অক্ষমেরাও সংসারের খুব একটা বৃহৎ অংশের শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখনকার কাব্য উপন্যাসও ভীষ্মদ্রোণকে ছাড়িয়া এই সমস্ত মূকজাতির ভাষা এই সমস্ত ভস্মাচ্ছন্ন অঙ্গারের আলোক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

সমীর কহিল—"নবোদিত সাহিত্যসূর্য্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্ত্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটীরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।"

মন

এই-যে মধ্যাহ্ন কালে নদীর ধারে পাড়াগাঁয়ের একটি একতালা ঘরে বসিয়া আছি ; টিকটিকি ঘরের কোণে টিক্‌টিক্ করিতেছে ; দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে এক জোড়া চড়ুই পাখী বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচ্ মিচ্ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে ; নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে—উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে ; বাতাসটি স্নিগ্ধ, আকাশটি পরিষ্কার, পরপারের অতি দূর তীররেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবর্ত্তী বেড়া দেওয়া ছোটো বাগানটি পর্য্যন্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একখণ্ড ছবির মতো দেখাইতেছে ;—এই তো বেশ আছি ; মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেম্‌নি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ, আদরপূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দ্দিক হইতে আমার সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এই ভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কী ? কাগজ কলম লইয়া বসিবার জন্য কে তোমাকে খোঁচাইতেছিল ? কোন্ বিষয়ে তোমার কী মত, কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি সে-কথা লইয়া হঠাৎ ধূমধাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিবার কী দরকার ছিল ? ঐ দেখো, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘূর্ণা বাতাস খানিকটা ধূলা এবং শুক্‌নো পাতার ওড়্‌না উড়াইয়া কেমন চমৎকারভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল ! পদাঙ্গুলি-মাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গীটি করিয়া মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইল, তাহার পর হুস্‌হাস্ করিয়া সমস্ত

উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সম্বল তো ভারি! গোটাকতক খড়কুটা ধূলাবালি সুবিধা-মতো যাহা হাতের কাছে আসে তাহাই লইয়া বেশ একটু ভাবভঙ্গী করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল! এম্‌নি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া বেড়ায়। না-আছে তাহার কোনো উদ্দেশ্য, না-আছে তাহার কেহ দর্শক! না-আছে তাহার মত, না-আছে তাহার তত্ত্ব; না-আছে সমাজ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সমীচীন উপদেশ! পৃথিবীতে যাহা-কিছু সর্ব্বাপেক্ষা অনাবশ্যক, সেই সমস্ত বিস্মৃত পরিত্যক্ত পদার্থ-গুলির মধ্যে একটি উত্তপ্ত ফুৎকার দিয়া তাহাদিগকে মুহূর্ত্তকালের জন্য জীবিত জাগ্রত সুন্দর করিয়া তোলে!

অম্‌নি যদি অত্যন্ত সহজে এক নিশ্বাসে কতকগুলা যাহা-তাহা খাড়া করিয়া সুন্দর করিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া লাটিম খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম! অম্‌নি অবলীলাক্রমে সৃজন করিতাম, অম্‌নি ফুঁ দিয়া ভাঙিয়া ফেলিতাম! চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, লক্ষ্য নাই; শুধু একটা নৃত্যের আনন্দ, শুধু একটা সৌন্দর্য্যের আবেগ, শুধু একটা জীবনের ঘূর্ণা। অবারিত প্রান্তর, অনাবৃত আকাশ, পরিব্যাপ্ত সূর্য্যালোক,—তাহারই মাঝখানে মুঠা মুঠা ধূলি লইয়া ইন্দ্রজাল নির্ম্মাণ করা, সে কেবল ক্ষ্যাপা হৃদয়ের উদার উল্লাসে।

এ হইলে তো বুঝা যায়। কিন্তু বসিয়া বসিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কতকগুলা নিশ্চল মতামত উচ্চ করিয়া তোলা! তাহার মধ্যে না-আছে গতি, না-আছে প্রীতি, না-আছে প্রাণ! কেবল একটা কঠিন কীর্ত্তি। তাহাকে কেহ বা হাঁ করিয়া দেখে, কেহ বা পা দিয়া ঠেলে—যোগ্যতা যেমনি থাক্!

কিন্তু ইচ্ছা করিলেও এ-কাজে ক্ষান্ত হইতে পারি নাই। সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয়

দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিতেছি ঐ একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় একটা চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শাল-পাতের ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে। ওটি আমার ভৃত্য, নাম নারায়ণ সিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত। উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্য্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁটাল-গাছটির মতো। এইরূপ মানুষ এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত ঠিক মিশ খায়। প্রকৃতি এবং ইহার মাঝখানে বড়ো একটা বিচ্ছেদচিহ্ন নাই। এই জীবধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্য্যন্ত কেবল একটি আতাগাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কিছুর জন্য কোনো মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণ সিংটি তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণ সিং।

কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আতা-গাছটির মাঝখানে কেবল এক ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়, তবে ঐ সরস শ্যামল দারু-জীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়! তবে চিন্তায় উহার চিক্কণ সবুজ পাতাগুলি ভূর্জ্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠে এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্য্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে। তখন বসন্তকালে আর কি অমন দুই চারিদিনের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ কচিপাতায় পুলকিত হইয়া উঠে, বর্ষাশেষে ঐ গুটি-আঁকা গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে প্রত্যেক শাখা আর কি ভরিয়া যায়? তখন সমস্ত দিন একপায়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, আমার কেবল কতকগুলা পাতা হইল কেন, পাখা হইল না কেন? প্রাণপণে সিধা

হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তবু কেন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না? ঐ দিগন্তের পরপারে কী আছে? ঐ আকাশের তারাগুলি যে-গাছে শাখায় ফুটিয়া আছে সে গাছ কেমন করিয়া নাগাল পাইব? আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, এ কথা যতক্ষণ না স্থির হইবে ততক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ডাল শুকাইয়া, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছিও বটে নাইও বটে, এ প্রশ্নের যতক্ষণ মীমাংসা না হয় ততক্ষণ আমার জীবনে কোনো সুখ নাই। দীর্ঘ বর্ষার পর যেদিন প্রাতঃকালে প্রথম সূর্য্য ওঠে সেদিন আমার মজ্জার মধ্যে যে একটি পুলক সঞ্চার হয় সেটা আমি ঠিক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব, এবং শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি যেদিন হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস ওঠে, সেদিন ইচ্ছা করে—কী ইচ্ছা করে কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে!

এই সমস্ত কাণ্ড! গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা বেশি হইবার চেষ্টা করিয়া, যে রকম আছে আর একরকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এ-দিক, না হয় ও-দিক। অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়, একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, অরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্ম্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।

যদি কোনো প্রবল শয়তান সরীসৃপের মতো লুকাইয়া মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া, শত লক্ষ আঁকা-বাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া

পাখীর গানের মধ্যে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্ত্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিকপত্র, সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না!

ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই! ভাগ্যে ধুতুরাগাছ কামিনীগাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না, তোমার ফুলের কোমলতা আছে কিন্তু ওজস্বিতা নাই এবং ফুল ফল কাঁটালকে বলে না তুমি আপনাকে বড়ো মনে করো কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুষ্মাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই! কদলী বলে না, আমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র প্রচার করি, এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎ পত্রের আয়োজন করে না!

তর্ক তাড়িত চিন্তা-তাপিত বক্তৃতা-শ্রান্ত মানুষ উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তা-রেখাহীন জ্যোতির্ম্ময় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া, অরণ্যের ভাষাহীন মর্ম্মর ও তরঙ্গের অর্থহীন কলধ্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া তবে কতকটা স্নিগ্ধ ও সংযত হইয়া আছে। ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ নিবৃত্ত করিবার জন্য এই অনন্ত প্রসারিত অ-মনঃসমুদ্রের প্রশান্ত নীলাম্বুরাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আসল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। খাইবার, পরিবার, জীবনধারণ করিবার, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক, মনটা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বড়ো হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দ্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তোলে, যাহাকে

একভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর একভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোনো কালে কিছুতেই বোঝা যায় না, অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে,—এমন কি, এ সকল অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গর্হিত কার্য্য করে।

কিন্তু আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণ সিংহের মনটি উহার শরীরের মাপে ; উহার আবশ্যকের গায়ে গায়ে ঠিক ফিট করিয়া লাগিয়া আছে। উহার মনটি উহার জীবনকে শীতাতপ, অসুখ, অস্বাস্থ্য এবং লজ্জা হইতে রক্ষা করে, কিন্তু যখন-তখন উনপঞ্চাশ বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে উড়ু-উড়ু করে না। এক-আধটা বোতামের ছিদ্র দিয়া বাহিরের চোরা-হাওয়া উহার মানস আবরণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে কখনো একটু-আধটু স্ফীত করিয়া তোলে না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ততটুকু মনশ্চাঞ্চল্য তাহার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই আবশ্যক।

(সাধনা, ১৩০০)

কৌতুকহাস্য

শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুররস হাঁকিয়া যাইতেছে। ভোরের দিককার ঝাপ্‌সা কুয়াশাটা কাটিয়া গিয়া তরুণ রৌদ্রে দিনের আরম্ভ-বেলাটা একটু উপভোগযোগ্য আতপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সমীর চা খাইতেছে, ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়িতেছে এবং ব্যোম মাথার চারিদিকে একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল নীলে সবুজে মিশ্রিত গলাবন্ধের পাক জড়াইয়া একটা অসঙ্গত মোটা লাঠি হস্তে সম্প্রতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অদূরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি পরস্পরের কটিবেষ্টন করিয়া কী-একটা রহস্যপ্রসঙ্গে বারম্বার হাসিয়া অস্থির হইতেছিল। ক্ষিতি এবং সমীর মনে করিতেছিল এই উৎকট নীল-হরিত পশম-রাশিপরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিন্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাস্যরসো-চ্ছ্বাসের মূল কারণ।

এমন সময় অন্যমনস্ক ব্যোমের চিত্তও সেই হাস্যরবে আকৃষ্ট হইল। চৌকিটা সে আমাদের দিকে ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল, "দূর হইতে একজন পুরুষমানুষের হঠাৎ ভ্রম হইতে পারে যে, ঐ দুটি সখী বিশেষ কোনো একটা কৌতুক-কথা অবলম্বন করিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু সেটা মায়া। পুরুষজাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনাকৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু মেয়েরা হাসে কী জন্য তাহা "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" চকমকি পাথর স্বভাবত আলোকহীন;—উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে সে অট্টশব্দে জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর মাণিকের টুকরা আপনা-আপনি আলোয় ঠিকরিয়া পড়িতে থাকে কোনো একটা

সঙ্গত উপলক্ষ্যের অপেক্ষা রাখে না। মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে; কারণ ব্যতীত কার্য হয় না জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই খাটে।

সমীর নিঃশেষিতপাত্রে দ্বিতীয়বার চা ঢালিয়া কহিল—"কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্যরসটাই আমার কাছে কিছু অসংগত ঠেকে। দুঃখে কাঁদি, সুখে হাসি এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না—কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক তো ঠিক সুখ নয়। মোটা মানুষ চৌকি ভাঙিয়া পড়িয়া গেলে আমাদের কোনো সুখের কারণ ঘটে এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু হাসির কারণ ঘটে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় আছে।"

ক্ষিতি কহিল—"কথাটা এই যে কৌতুকে আমরা হাসি কেন। একটা কিছু ভালো লাগিবার বিষয় যেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল অমনি আমাদের গলার ভিতর দিয়া একটা অদ্ভুত প্রকারের শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং আমাদের মুখের সমস্ত মাংসপেশী বিকৃত হইয়া সম্মুখের দন্তপাক্তি বাহির হইয়া পড়িল—মানুষের মতো ভদ্র জীবের পক্ষে এমন একটা অসংযত অসংগত ব্যাপার কি সামান্য অদ্ভুত এবং অপমানজনক? য়ুরোপের ভদ্রলোক ভয়ের চিহ্ন দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন—আমরা প্রাচ্যজাতীয়েরা সভাসমাজে কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটাকে নিতান্ত অসংযমের পরিচয় জ্ঞান করি—"

সমীর ক্ষিতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল—"তাহার কারণ, আমাদের মতে কৌতুকে আমোদ অনুভব করা নিতান্ত অযৌক্তিক। উহা ছেলেমানুষেরই উপযুক্ত। এইজন্য কৌতুক রসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছেবলামী বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। একটা গানে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে হুঁকা হস্তে রাধিকার

ঘুঁটের কিঞ্চিৎ অভাবের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন, শুনিয়া শ্রোতামাত্রের হাস্য উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু ঘুঁটে-হস্তে শিক্ষকের কল্পনা সুন্দরও নহে, কাহারও পক্ষে আনন্দজনক নহে—তবুও যে, আমাদের হাসি ও আমোদের উদয় হয় তাহা অদ্ভুত ও অমূলক নহে তো কী? এইজন্যই এরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ সমাজের অনুমোদিত নহে। ইহা যেন অনেকটা পরিমাণে শারীরিক; কেবল স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি এমন-কি স্বার্থবোধেরও যোগ নাই। অতএব অনর্থক সামান্য কারণে ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধির এরূপ অনিবার্য পরাভব, স্থৈর্যের এরূপ সম্যক্ বিচ্যুতি, মন-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে লজ্জাজনক সন্দেহ নাই।"

ক্ষিতি একটু ভাবিয়া কহিল—"সে কথা সত্য। কোনো অখ্যাতনামা কবি-বিরচিত এই কবিতাটি বোধ হয় জানা আছে—

তৃষার্ত হইয়া চাহিলাম একঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল।

তৃষার্ত ব্যক্তি যখন এক ঘটি জল চাহিতেছে তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া আধখানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তির তাহাতে আমোদ অনুভব করিবার কোনো ধর্মসংগত অথবা যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে একঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদনা-বৃত্তিপ্রভাবে আমরা সুখ পাই; কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না, কী বৃত্তিপ্রভাবে আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়। এই সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে যখন শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তখন দুইয়ের বিভিন্ন প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিণীপনাই এইরূপ—কোথাও বা অনাবশ্যক অপব্যয়, কোথাও অত্যাবশ্যকের বেলায় টানাটানি! এক হাসির দ্বারা, সুখ এবং কৌতুক দুটোকে সারিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই।"

ব্যোম কহিল—"প্রকৃতির প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ হইতেছে। সুখে আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। একটা আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক।"

সমীর ব্যোমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল—"আমোদ এবং কৌতুক ঠিক নহে, বরঞ্চ তাহা নিয়মাত্রার দুঃখ। স্বল্প পরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন আমাদের চেতনার উপর যে আঘাত করে তাহাতে আমাদের সুখ হইতেও পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিনা কষ্টে আমরা পাচকের প্রস্তুত অন্ন খাইয়া থাকি, তাহাকে আমরা আমোদ বলি না। কিন্তু যেদিন "চড়িভাতি" করা যায় সেদিন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া অসময়ে সম্ভবত অখাদ্য আহার করি, তবু তাহাকে বলি আমোদ। আমোদের জন্য আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পরিমাণে কষ্ট ও অশান্তি জাগ্রত করিয়া তুলি, তাহাতে আমাদের চেতনাশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। কৌতুকও সেই জাতীয় সুখাবহ দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের চিরকাল যেরূপ ধারণা আছে, তাঁহাকে হুঁকা-হস্তে রাধিকার কুটিরে আনিয়া উপস্থিত করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণায় আঘাত করে। সেই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক; কিন্তু সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে-পরিমাণে দুঃখ দেয় আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী করে। এই সীমা ঈষৎ অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির কীর্ত্তনের মাঝখানে কোনো রসিকতাবায়ুগ্রস্ত ছোকরা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্রকূটধূম-পিপাসুতার গান গাহিত তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না; কারণ আঘাতটা এত গুরুতর হইত যে, তৎক্ষণাৎ তাহা উদ্যত মুষ্টি আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাত-স্বরূপে ধাবিত হইত। অতএব, আমার মতে কৌতুক—চেতনাকে পীড়ন; আমোদও তাই।

এইজন্য প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ স্মিতহাস্য এবং আমোদ ও কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্য ;—সে হাস্য যেন হঠাৎ একটা দ্রুত আঘাতের পীড়ন-বেগে সশব্দে উর্দ্ধে উদ্গীর্ণ হইয়া উঠে।"

ক্ষিতি কহিল—"তোমরা যখন একটা মনের মতো থিওরির সঙ্গে একটা মনের মতো উপমা জুটাইয়া দিতে পারো, তখন আনন্দে আর সত্যাসত্য জ্ঞান থাকে না। ইহা সকলেরই জানা আছে কৌতুকে যে কেবল আমরা উচ্চহাস্য হাসি তাহা নহে, মৃদুহাস্যও হাসি, এমন কি, মনে মনেও হাসিয়া থাকি। কিন্তু ওটা একটা অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ; এবং চিত্তের অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখজনক। আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসঙ্গত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য; সমস্তই চিরাভ্যস্ত, চির-প্রত্যাশিত; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমিমধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না। ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসঙ্গত ব্যাপারের অবতারণা হয়, তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা সুখের নহে, সৌন্দর্য্যের নহে, সুবিধার নহে, তেমনি আবার অনতিদুঃখেরও নহে; সেইজন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়।"

আমি কহিলাম—"অনুভবক্রিয়ামাত্রই সুখের, যদি না তাহার সহিত কোনো গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত থাকে। এমন কি, ভয় পাইতেও সুখ আছে, যদি তাহার সহিত বাস্তবিক ভয়ের কোনো কারণ জড়িত না থাকে। ছেলেরা ভূতের গল্প শুনিতে একটা বিষম আকর্ষণ অনুভব করে, কারণ, হৃৎকম্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে। রামায়ণে সীতাবিয়োগে রামের দুঃখে

আমরা দুঃখিত হই, ওথেলোর অমূলক অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশরবিদ্ধ উন্মাদ লিয়রের মর্মঘাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি—কিন্তু সেই দুঃখপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত। বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি; কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এইজন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন; অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাসরঘরে কর্ণমর্দন এবং অন্যান্য পীড়ন-নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন;—হঠাৎ উৎকট বোমার আওয়াজ করা আমাদের দেশে উৎসবের অঙ্গ।"

ক্ষিতি কহিল—"বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও। কথাটা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। যতটুকু পীড়নে সুখ বোধ হয় তাহা তোমরা অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি যে, কমেডির হাস্য এবং ট্রাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে,—"

ব্যোম কহিল—"যেমন বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিকঝিক করিতে থাকে, এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে। তুমি কতকগুলি প্রহসন ও ট্রাজেডির নাম করো, আমি তাহা হইতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি—"

এমন সময় দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীপ্তি কহিলেন—"তোমরা কী প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ?"

ক্ষিতি কহিল—"আমরা প্রমাণ করিতেছিলাম, যে, তোমরা এতক্ষণ বিনা কারণে হাসিতেছিলে।"

শুনিয়া দীপ্তি স্রোতস্বিনীর মুখের দিকে চাহিলেন, স্রোতস্বিনী দীপ্তির মুখের দিকে চাহিলেন, এবং উভয়ে পুনরায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোম কহিল—"আমি প্রমাণ করিতে যাইতেছিলাম যে, কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি, এবং ট্রাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।"

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর সুমিষ্ট সম্মিলিত হাস্যরবে পুনশ্চ গৃহ কূজিত হইয়া উঠিল, এবং অনর্থক হাস্য উদ্রেকের জন্য উভয়ে উভয়কে দোষী করিয়া পরস্পরকে তর্জ্জন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে সলজ্জভাবে দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষ সভ্যগণ এই অকারণ হাস্যোচ্ছ্বাসদৃশ্যে স্মিতমুখে অবাক হইয়া রহিল। কেবল সমীর কহিল—"ব্যোম, বেলা অনেক হইয়াছে, এখন তোমার ঐ বিচিত্রবর্ণের নাগপাশ বন্ধনটা খুলিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা দেখি না।"

ক্ষিতি ব্যোমের গাত্রিগাছটি তুলিয়া অনেকক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—"ব্যোম, তোমার এই গলাবানি কি কমেডির বিষয়, না, ট্রাজেডির উপকরণ?"

কৌতুকহাস্যের মাত্রা

সেদিনকার ডায়ারিতে কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া শ্রীমতী দীপ্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"একদিন প্রাতঃকালে স্রোতস্বিনীতে ও আমাতে মিলিয়া হাসিয়াছিলাম। ধন্য সেই প্রাতঃকাল এবং ধন্য দুই সখীর হাস্য! জগৎসৃষ্টি অবধি এমন চাপল্য অনেক রমণীই প্রকাশ করিয়াছে—এবং ইতিহাসে তাহার ফলাফল ভালো-মন্দ নানা আকারে স্থায়ী হইয়াছে। নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা অনেক মন্দাক্রান্তা, উপেন্দ্রবজ্রা, এমন কি শার্দ্দূল-বিক্রীড়িতচ্ছন্দ, অনেক ত্রিপদী, চতুষ্পদী এবং চতুর্দ্দশপদীর আদি কারণ হইয়াছে এইরূপ শুনা যায়। রমণী তরলস্বভাববশতঃ অনর্থক হাসে, মাঝের হইতে তাহা দেখিয়া অনেক পুরুষ অনর্থক কাঁদে, অনেক পুরুষ ছন্দ মিলাইতে বসে, অনেক পুরুষ গলায় দড়ি দিয়া মরে—আবার এইবার দেখিলাম নারীর হাস্যে প্রবীণ ফিলজফরের মাথায় নবীন ফিলজফি বিকশিত হইয়া উঠে! কিন্তু সত্য কথা বলিতেছি, তত্ত্ব-নির্ণয় অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের অবস্থাটা আমরা পছন্দ করি।"

এই বলিয়া সেদিন আমরা হাস্য সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম শ্রীমতী দীপ্তি তাহাকে যুক্তিহীন অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

আমার কথা এই যে, আমাদের সেদিনকার তত্ত্বের মধ্যে যে যুক্তির প্রাবল্য ছিল না সেজন্য শ্রীমতী দীপ্তির রাগ করা উচিত হয় না। কারণ, নারীহাস্যে পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থপাত করে,

তাহার মধ্যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রংশও একটি। যে-অবস্থায় আমাদের ফিলজফি প্রলাপ হইয়া উঠিয়াছিল সে-অবস্থায় নিশ্চয়ই মনে করিলেই কবিতা লিখিতেও পারিতাম,এবং গলায় দড়ি দেওয়াও অসম্ভব হইত না।

যাহা হউক, সেদিন মোটের উপরে আমরা প্রশ্নটা এই তুলিয়াছিলাম, যে, যেমন দুঃখের কান্না, তেম্‌নি সুখের হাসি আছে—কিন্তু মাঝে হইতে কৌতুকের হাসিটা কোথা হইতে আসিল? কৌতুক জিনিষটা কিছু রহস্যময়। জন্তুরাও সুখ দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু কৌতুক অনুভব করে না। অলঙ্কারশাস্ত্রে যে-ক'টা রসের উল্লেখ আছে সব রসই জন্তুদের অপরিণত অপরিস্ফুট সাহিত্যের মধ্যে আছে, কেবল হাস্যরসটা নাই। হয়তো বানরের প্রকৃতির মধ্যে এই রসের কথঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, কিন্তু বানরের সহিত মানুষের আরো অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে।

যাহা অসঙ্গত, তাহাতে মানুষের দুঃখ পাওয়া উচিৎ ছিল, হাসি পাইবার কোনো অর্থই নাই। পশ্চাতে যখন চৌকি নাই তখন চৌকিতে বসিতেছি মনে করিয়া কেহ যদি মাটিতে পড়িয়া যায়, তবে তাহাতে দর্শকবৃন্দের সুখানুভব করিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। এমন একটা উদাহরণ কেন, কৌতুকমাত্রেরই মধ্যে একটা পদার্থ আছে যাহাতে মানুষের সুখ না হইয়া দুঃখ হওয়া উচিত।

আমরা কথায় কথায় সেদিন ইহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম কৌতুকের হাসি এবং আমোদের হাসি একজাতীয়—উভয় হাস্যের মধ্যেই একটা প্রবলতা আছে। তাই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, যে হয়তো আমোদ এবং কৌতুকের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; সেইটে বাহির করিতে পারিলেই কৌতুকহাস্যের রহস্য ভেদ হইতে পারে।

সাধারণভাবের সুখের সহিত আমোদের একটা প্রভেদ আছে।

নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিষটা নিত্যনৈমিত্তিক সহজ নিয়মসঙ্গত নহে; তাহা মাঝে মাঝে এক একদিনের; তাহাতে প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমাদের প্রধান উপকরণ।

আমরা বলিয়াছিলাম কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অনতিঅধিকমাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাসিয়া উঠি। যাহা সুসঙ্গত তাহা চিরদিনের নিয়মসঙ্গত, যাহা অসঙ্গত তহা ক্ষণকালের নিয়মভঙ্গ। যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মনের কোনো উত্তেজনা নাই, হঠাৎ না হইলে কিম্বা আর একরূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।

সেদিন আমরা এই পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম—আর বেশি দূর যাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আর যে যাওয়া যায় না তাহা নহে। আরো বলিবার কথা আছে।

শ্রীমতী দীপ্তি প্রশ্ন করিয়াছেন, যে, আমাদের চার পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তবে চলিতে চলিতে হঠাৎ অল্প হুঁচট্ খাইলে কিম্বা রাস্তায় যাইতে অকস্মাৎ অল্পমাত্রায় দুর্গন্ধ নাকে আসিলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্তত উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভব করা উচিত।

এ প্রশ্নের দ্বারা আমাদের মীমাংসা খণ্ডিত হইতেছে না, সীমাবদ্ধ হইতেছে মাত্র। ইহাতে কেবল এইটুকু দেখা যাইতেছে যে, পীড়নমাত্রেই কৌতুকজনক উত্তেজনা জন্মায় না; অতএব, এক্ষণে দেখা আবশ্যক কৌতুকপীড়নের বিশেষ উপকরণটা কী।

জড়প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই। একটা বড়ো পাথর ছোটো পাথরকে গুঁড়াইয়া ফেলিলেও আমাদের চোখে জল আসে না, এবং সমতলক্ষেত্রের মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা খাপছাড়া গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইলে তাহাতে আমাদের হাসি পায় না। নদী নির্ঝর পর্ব্বত সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিক অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা বাধাজনক, বিরক্তিজনক, পীড়াজনক হইতে পারে, কিন্তু কোনো স্থানেই কৌতুহলজনক হয় না। সচেতন পদার্থ-সম্বন্ধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।

কেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত; কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।

আমাদের ভাষায় কৌতুক এবং কৌতূহল শব্দের অর্থের যোগ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে একই অর্থে বিকল্পে উভয় শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান করি কৌতূহল-বৃত্তির সহিত কৌতুকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা—কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নূতনত্ব। অসঙ্গতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে, সঙ্গতের মধ্যে তেমন নাই।

কিন্তু প্রকৃত অসঙ্গতি ইচ্ছাশক্তির সহিত জড়িত, তাহা জড় পদার্থের মধ্যে নাই। আমি যদি পরিষ্কার পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ দুর্গন্ধ পাই তবে আমি নিশ্চয় জানি, নিকটে কোথায় এক জায়গায় দুর্গন্ধ বস্তু আছে তাই এইরূপ ঘটিল; ইহাতে কোনোরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জড়প্রকৃতিতে যে-যে কারণে যাহা হইতেছে তাহা ছাড়া আর কিছু হইবার জো নাই, ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখি একজন মান্য বৃদ্ধ

ব্যক্তি খেম্‌টা-নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসঙ্গত ঠেকে ; কারণ, তাহা অনিবার্য্য-নিয়মসঙ্গত নহে। আমরা বৃদ্ধের নিকট কিছুতেই এরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি না, কারণ, সে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন লোক ; সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে ; ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। জড়ের নাকি নিজের ইচ্ছা-মতো কিছু হয় না, এইজন্য জড়ের পক্ষে কিছুই অসঙ্গত কৌতুকাবহ হইতে পারে না। এইজন্য অনপেক্ষিত হুঁচট্ বা দুর্গন্ধ হাস্যজনক নহে। চায়ের চামচ যদি দৈবাৎ চায়ের পেয়ালা হইতে চ্যুত হইয়া দোয়াতের কালির মধ্যে পড়িয়া যায় তবে সেটা চামচের পক্ষে হাস্যকর নহে—ভারাকর্ষণের নিয়ম তাহার লঙ্ঘন করিবার জো নাই ; কিন্তু অন্যমনস্ক লেখক যদি তাঁহার চায়ের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া চা খাইবার চেষ্টা করেন তবে সেটা কৌতুকের বিষয় বটে। ধর্ম্মনীতি যেমন জড়ে নাই, অসঙ্গতিও সেইরূপ জড়ে নাই। মনঃপদার্থ প্রবেশ করিয়া যেখানে দ্বিধা জন্মাইয়া দিয়াছে, সেইখানেই উচিত এবং অনুচিত, সঙ্গত এবং অদ্ভুত।

কৌতূহল জিনিষটা অনেক স্থলে নিষ্ঠুর ; কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে। সিরাজদ্দৌলা দুইজনের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য পূরিয়া দিতেন এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়—উভয়ে হাঁচিতে আরম্ভ করিত তখন সিরাজদ্দৌলা আমোদ অনুভব করিতেন। ইহার মধ্যে অসঙ্গতি কোন্‌খানে ? নাকে নস্য দিলে তো হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি। যাহাদের নাকে নস্য দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারণ, হাঁচিলেই তাহাদের দাড়িতে অকস্মাৎ টান পড়িবে ; কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতেই হইতেছে।

এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি, এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা

আছে। অনেক সময় আমরা যাহাকে লইয়া হাসি সে নিজের অবস্থাকে হাস্যের বিষয় জ্ঞান করে না। এইজন্যই পঞ্চভৌতিক সভায় ব্যোম বলিয়াছিলেন যে, কমেডি এবং ট্রাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাসি পায় এবং ট্রাজেডিতে যতদূর পর্য্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখে জল আসে। গর্দ্দভের নিকট অনেক টাইটেনিয়া অপূর্ব্ব মোহবশত যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকে তাহা মাত্রাভেদ এবং পাত্রভেদে মর্ম্মভেদী শোকের কারণ হইয়া উঠে।

অসঙ্গতি কমেডিরও বিষয়, অসঙ্গতি ট্রাজেডিরও বিষয়। কমেডিতেও ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। ফল্‌ষ্টাফ্ উইণ্ডসর-বাসিনী রঙ্গিণীর প্রেমলালসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুর্গতির একশেষ লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ;—রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিয়া, বনবাস-প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্য সুখের চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছেন এমন সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অসঙ্গতি দুই শ্রেণীর আছে ; একটা হাস্যজনক, আর একটা দুঃখজনক। বিরক্তিজনক, বিস্ময়জনক, রোষজনককেও আমরা শেষ শ্রেণীতে ফেলিতেছি।

অর্থাৎ অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়। শিকারী যখন অনেকক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলি বর্ষণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, তখন তাহার সেই

নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায়; কিন্তু কোনো লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থ মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্ম-কাল তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনামাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়।

স্থূল কথাটা এই যে, অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।

কেকা-ধ্বনি

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ূরের ডাক শুনিয়া আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন— আমি ঐ ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারি না ; কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন, বুঝিবার জো নাই।

কবি যখন বসন্তের কুহুস্বর এবং বর্ষার কেকা—দুইটাকেই সমান আদর দিয়াছেন, তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝি কৈবল্যদশা-প্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার কাছে ভালো ও মন্দ, ললিত ও কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লীর ঝঙ্কারকে কেহ মধুর বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। প্রেয়সীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু ষড়্ঋতুর মহাসঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন।

একপ্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্ত্তমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া, মন তাহার সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে —ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া ; এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে ; —বলে, নিতান্তই মিষ্ট, কেবলি মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়। যাহারা গানের সমঝ্‌দার, এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা

এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয় সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসা দ্বারা অপমানিত করে; মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে-লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না; সে বলে, আমাকে শুখ্‌নো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব। গানের উপযুক্ত সমঝদার বলে, বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইয়ো না,—আমাকে শুখ্‌নো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুসি হইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়া দিব। বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিষের মূল্য নামাইয়া দেয়।

যাহা সহজেই মিষ্ট, তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশি-ক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমা উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, আর কেন ঢের হইয়াছে।

এইজন্য যে-লোক যে-বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিক্‌কার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদূর নহে, তাহা সে বোঝে; এইজন্য তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে, অথচ তখনো সে তাহার সীমা পায় না—এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমঝ্‌দারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত-ব্যাপার বলিয়া মনে করে, অনেক সময় তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যা-সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন একপক্ষ বলে, তুমি কী বুঝিবে;—আর এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝো, জগতে আর কেহ বোঝে না!

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্ত্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্ত্তীর সহিত বৈচিত্র্য-সাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতেই চট্ করিয়া যে-সুখ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর। এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গেই ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর, তাহা আপাতত বহুলোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে—তাহার মধ্যে যে-একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে, তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা" ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়—তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। ললিতলবঙ্গলতার পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক :—

> আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
> বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
> পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
> সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষর বহুল,—তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষাও কানে মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এরূপ সৃজনের অবসর পায়। "পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা"

—ইহার মধ্যে লয়ের যে-উত্থান আছে, কঠোর কোমলে যথাযথরূপে মিলিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতি-প্রত্যক্ষ নহে—তাহা নিগূঢ়; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুসি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য্য, তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে—সে-সঙ্গীত সমস্ত শব্দ-সঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়—মনে হয় যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে, সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে, সময়-বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র—নব-বর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতা-জটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারি গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমাল-তালী বনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্য-পিপাসু ঊর্দ্ধবাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্ম্মর মুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্য ক্রেঙ্কার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান,—কান তাহার মাধুর্য্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়।

মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকখানি পায়,—সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর,—বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারব এইজন্যই জড়িত। তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিক-বধূকে ব্যাকুল করে না—তাহা সমস্ত বর্ষার মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। নর-নারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল আকাশের গায়ে-গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানারঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্য শীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব্বচাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্প-পল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ়স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশ-বিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী স্বরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু আবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো;—ফুল ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক। তাই কেকারব বর্ষাঋতুর নিখাদ স্বর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নব বর্ষার মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘন-বর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণ-

বৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই—শচীর কোনো প্রাচীন কিঙ্করী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণ-ধূসর বর্ণ। নানাশস্য বিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্ব্বে ক্ষেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্ম্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ঐ বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডীকে আরো ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেয়ে। তাহা নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গে ঝিল্লীরব ভালোরূপ মেশে; কারণ যেমন মেঘ, যেমন ছায়া, তেম্নি ঝিল্লীরবও আর একটা আচ্ছাদন বিশেষ; তাহা স্বর-মণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ; তাহা বর্ষানিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।

(১৩০৮)

নববর্ষা

আষাঢ়ের মেঘ প্রতি বৎসর যখনি আসে, তখনই নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা ভুল করি না, কারণ, সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সংকোচের সঙ্গে সে সঙ্কুচিত হয় না।

মেঘে আমার কোনো চিহ্ন নাই। সে পথিক, আসে যায়, থাকে না! আমার জরা তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশা-নৈরাশ্য হইতে সে বহুদূরে।

এইজন্য, কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-শিখর হইতে যে-আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন আমরাও সেই মেঘ দেখিয়াছি,ইতিমধ্যে পরিবর্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে অবন্তী, সে বিদিশা কোথায়? মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চির-নূতন চির-পুরাতন হইয়া দেখা দেয়, বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্টস্বপ্নের মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

মেঘ দেখিলে "সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ" সুখীলোকেরও আনমনা ভাব হয়, এইজন্যই। মেঘ মনুষ্য-লোকের কোনো ধার ধারে না বলিয়া মানুষকে অভ্যস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা, চেষ্টা, কাজকর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তখন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভুশাপে নির্বাসিত যক্ষের বিরহ তখন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ সংসারের সম্বন্ধ; মেঘ সংসারের এই প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলাকে ভুলাইয়া দেয়, তখনি হৃদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

মেঘ আপনার নিত্য-নূতন চিত্র-বিন্যাসে, অন্ধকারে, গর্জনে বর্ষণে,

চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে,—একটা বহুদূর কালের এবং বহুদূর দেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে,—তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মপাশ-বদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিক-বধূ তখন এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জ্ঞানে জানে মাত্র; সে নিয়ম যে এখনো বলবান্ আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ কথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম, ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী—এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব্ব হইয়া গেছে। আমি তাহাকে যতটুকু পাইয়াছি তাহাকে ততটুকু বলিয়াই জানি, আমার ভোগের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব আমি গণ্যই করি না। জীবন শক্ত হইয়া বাঁধিয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের আবশ্যক পৃথিবীটুকুকে টানিয়া আঁটিয়া লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের পৃথিবীর মধ্যে এখন আর কোনো রহস্য দেখিতে পাই না বলিয়াই শান্ত হইয়া আছি। নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের পৃথিবীটুকুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছি। এমন সময় পূর্ব্ব-দিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত-শতাব্দী পূর্ব্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়! সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকা-পুরীতে, কোন্ চির-যৌবনের রাজ্যে, চির-বিচ্ছেদের বেদনায় চির-মিলনের আশ্বাসে, চির সৌন্দর্য্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন, পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড়ো হইয়া উঠে; যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিষের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে।

আমার নিত্য-কর্ম্মক্ষেত্রকে নিত্য-পরিচিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া

দিয়া সজলমেঘ-মেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাব-লোকের মধ্যে সমস্ত বিধি বিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয় —পৃথিবীর এই কয়টা বৎসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়ুর বিশালত্বের মাঝখানে স্থাপন করে; আমাকে রামগিরি আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গীহীন করিয়া ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জ্জন শিখর, এবং আমার কোনো এক চির-নিকেতন অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান অলকাপুরীর মাঝখানে একটি সুবৃহৎ সুন্দর পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে;—নদীকলধ্বনিত, সানুমৎ-পর্ব্বত-বন্ধুর, জম্বুকুঞ্জচ্ছায়া-ন্ধকার, নব-বারিসিঞ্চিত যূথী-সুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবী! হৃদয় সেই পৃথিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্গে শৃঙ্গে নদীর কূলে কূলে ফিরিতে ফিরিতে অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎসুক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।

মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্ব্বচনীয় কবিত্ব-গাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।

পূর্ব্বমেঘে বৃহৎ পৃথিবী আমাদের কল্পনার কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আমরা সম্পন্ন গৃহস্থটি হইয়া আরামে সন্তোষের অর্দ্ধ-নিমীলিত লোচনে যে গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে ঘর-ছাড়া করিয়া দিল। আমাদের গোয়ালঘর-গোলাবাড়ির বহুদূরে যে আবর্ত্ত-চঞ্চলা নর্ম্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে-চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নব নীপে বিকশিত, উদয়নকথা-কোবিদ গ্রাম-বৃদ্ধদের দ্বারের নিকট যে চৈত্য বট শুক-কাকলীতে মুখর তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্যের চিরসত্যে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

বিরহীর ব্যগ্রতাতেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আষাঢ়ের নীলাভ মেঘচ্ছায়াবৃত নগ-নদী-নগর-জনপদের উপর দিয়া রহিয়া রহিয়া ভাবাবিষ্ট অলস-গমনে যাত্রা করিয়াছেন। যে তাঁহার মুগ্ধনয়নকে অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়াছে, তিনি তাহাকে আর "না" বলিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌন্দর্য্যে মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন। যে-চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে, তাহার সুদীর্ঘ পথটিও মনোহর, সে-পথকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ষায় অভ্যস্ত পরিচিত সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মন বাহিরের দিকে যাইতে চায়, পূর্ব্বমেঘে কবি আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বেলিত করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন—আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সে পৃথিবী 'অনাঘ্রাতং পুষ্পম্', তাহা আমাদের প্রাত্যহিক ভোগের দ্বারা কিছুমাত্র মলিন হয় নাই, সে-পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়ের প্রাচীর দ্বারা কল্পনা কোনোখানে বাধা পায় না। যেমন ঐ মেঘ, তেম্‌নি সেই পৃথিবী। আমার এই সুখদুঃখ-ক্লান্তি-অবসাদের জীবন তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। প্রৌঢ়-বয়সের নিশ্চয়তা বেড়া দিয়া ঘের দিয়া তাহাকে নিজের বাস্তু-বাগানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল পূর্ব্বমেঘ। নব মেঘের আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারিদিকে একটি পরম-নিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া, "জননান্তরসৌহৃদানি" মনে করাইয়া দেয়—অপরূপ সৌন্দর্য্য-লোকের মধ্যে কোনো একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।

পূর্ব্বমেঘে বহুবিচিত্রের সহিত সৌন্দর্য্যের পরিচয় এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা, এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।

নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্ম্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্ব্বাসন! প্রভুর অভিশাপেই এখানে আট্‌কা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই পূর্ব্বমেঘের গান এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ।

সকল কবির কাব্যেই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে! প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবার তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

যে-কবির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে, আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্য শ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি,—পুষ্পিত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্যগহ্বরের ধারে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হয়। এইজন্য কোনো কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার পূর্ব্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন্ সিংহদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।

(১৩০৮)

পাগল

পশ্চিমের একটি ছোটো সহর। সম্মুখে বড়ো রাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার সবুজ মেঘের মতো স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন আকাশের দিগন্ত রেখা পর্য্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।

আজ এই সহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগুণ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জরুরী লেখা পড়িয়া আছে—তাহারা পড়িয়াই রহিল। জানি, তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে; তা হউক্, সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পূর্ণতা কোন্ মূর্ত্তি ধরিয়া হঠাৎ কখন আপনার আভাস দিয়া যায়, তাহা তো আগে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু যখন সে দেখা দিল, তখন তাহাকে শুধু-হাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তখন লাভ-ক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে, সে খুব হিসাবী লোক—সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে—কিন্তু হে নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ম্ময় অবকাশ, তোমার শুভ্র মেঘমাল্য-খচিত ক্ষণিক অভ্যুদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরী কাজ আমি মাটি করিলাম—আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করিলাম না—আজ আমি বর্ত্তমানের কাছে বিকাইলাম!

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা কিছুই দাবী করে না ;—তখন হিসাবের অঙ্কে ভুল হয় না, তখন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন একদিনের সঙ্গে আর-একদিন, এক কাজের সঙ্গে আর-এক কাজ দিব্য গাঁথিয়া গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমানভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো খবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোনো মিল হয় না—তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত 'খেই' হারাইয়া যায়—তখন বাঁধা-কাজের পক্ষে বড়োই মুস্কিল ঘটে।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড় দিন ;—এই অনিয়মের দিন, এই কাজ নষ্ট করিবার দিন। যে-দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়—সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্যদিনগুলো বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন,—আর এক-একটা দিন পূরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।

পাগল-শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। ক্ষ্যাপা নিমাইকে আমরা ক্ষ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি—আমাদের ক্ষ্যাপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা ক্ষ্যাপামির একপ্রকার বিকাশ কি না, এ কথা লইয়া য়ুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে—কিন্তু আমরা এ-কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিভা ক্ষ্যাপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট্‌পালট্ করিতেই আসে—তাহা আজিকার এই খাপ্‌ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া, দিনের মতো হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়—কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে, কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে!

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমনই খাপ ছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই

ধৌত নীলাকাশের রৌদ্র-প্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার ডিমি-ডিমি ডমরু বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উলঙ্গ শুভ্রমূর্ত্তি এই কর্ম্ম-নিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণে-ক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ! একেবারে হিসাব কিতাব নাস্তানাবুত করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ যে একফোঁটা আমাকে দেয় নাই, তাহা বলিতে পারি না—ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে—আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়—এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত; আনন্দ, যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্য্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আনন্দ, দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে,—এইজন্য, কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর, আনন্দের পক্ষে ভালো-মন্দ দুইই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, "সেন্ট্রিফ্যুগল্"—তিনি কেবলি নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্র-পথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়ীরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই, তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য সুর ইহার নহে, ইহার মুখে বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধি-বিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্ব্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে। পাগলও ইহারি কীর্ত্তি এবং প্রতিভাও ইহারি কীর্ত্তি। ইহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায়, সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব্ব সুরে বাজিয়া উঠে, সে হইল প্রতিভাবান্। পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবান্ও তাই—কিন্তু পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান্ দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

শুধু পাগল নয়, শুধু প্রতিভাবান্ নয় আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর, তাহার জ্বলজ্জটা কলাপ লইয়া দেখা দেয়। তখন কত সুখ-মিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়! হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক-ধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে—সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহা-ধ্বনিতে নিশীথ-রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদ-ক্ষেপে সংসারে

মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে! সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়-হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে থাকো ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোলো। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়! সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে! নৃত্য করো, হে উন্মাদ্ নৃত্য করো! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজন-ব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়! হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক!

আমাদের এই ক্ষ্যাপা-দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

আজিকার এই মেঘোন্মুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরূপের মূর্তি জাগিয়াছে! সম্মুখের ঐ রাস্তা, ঐ খোড়োচাল দেওয়া মুদির দোকান, ঐ ভাঙা ভিটা, ঐ সরু গলি, ঐ গাছপালাগুলিকে প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজন্য উহারা আমাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, রোজ এই ক'টা

জিনিসের মধ্যেই নজরবন্দি করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাৎ তুচ্ছতা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতদিন পরিচিত বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভালো করিয়া দেখিতে ছিলামই না। আজ এই যাহা-কিছু সমস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ সেই সমস্তই আমার চারিদিকে আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া রাখে নাই—তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পাগল এইখানেই ছিলেন,—সেই অপূর্ব্ব, অপরিচিত, অপরূপ, এই মুদির দোকানের খোড়োচালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই—কেবল, যে আলোকে তাঁহাকে দেখা যায়, সে আলোক আমার চোখের উপর ছিল না। আজ আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সম্মুখের দৃশ্য, ঐ কাছের জিনিষ আমার কাছে একটি বহুসুদূরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সঙ্গে গৌরীশঙ্করের তুষার-বেষ্টিত দুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এম্‌নি করিয়া হঠাৎ একদিন জানিতে পারা যায়, যাহার সঙ্গে অত্যন্ত ঘরকন্না পাতাইয়া বসিয়াছিলাম, সে আমার ঘরকন্নার বাহিরে। আমি যাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তের বাঁধা-বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, তাহার মতো দুর্লভ দুরায়ত্ত জিনিষ কিছুই নাই। আমি যাহাকে ভালোরূপে জানি মনে করিয়া তাহার চারিদিকে সীমানা আঁকিয়া দিয়া খাতির-জমা হইয়া বসিয়াছিলাম, সে দেখি, কখন্ একমুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত সীমানা পার হইয়া অপূর্ব্ব-রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে নিয়মের দিক দিয়া, স্থিতির দিক দিয়া বেশ ছোটো-খাটো, বেশ দস্তুর-সঙ্গত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিক হইতে, ঐ শ্মশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলে মুখে আর বাক্য সরে না—আশ্চর্য্য! ও কে! যাহাকে চিরদিন

জানিয়াছি, সেই কি এই! যে একদিকে ঘরের, সে আর-একদিকে অন্তরের; যে একদিকে কাজের, সে আর-একদিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে; যাহাকে একদিকে স্পর্শ করিতেছি, সে আর-একদিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত; যে একদিকে সকলের সঙ্গে বেশ খাপ্ খাইয়া গিয়াছে, সে আর-একদিকে ভয়ঙ্কর খাপ্‌ছাড়া, আপনাতে আপনি!

প্রতিদিন যাঁহাকে দেখি নাই, আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারিদিকে পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা—আজ দেখিতেছি, মহা-অপূর্ব্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপিসের বড়ো সাহেবের মতো অত্যন্ত একজন সুগম্ভীর হিসাবী লোকের হাতে পড়িয়া সংসারে প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি—আজ সেই বড়ো সাহেবের চেয়ে যিনি বড়ো, সেই মস্ত বে-হিসাবী পাগলের বিপুল উদার অট্টহাস্য জলে-স্থলে আকাশে সপ্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতা-পত্র সমস্ত রহিল পড়িয়া! আমার জরুরি-কাজের বোঝা ঐ সৃষ্টি-ছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম—তাঁহার তাণ্ডব-নৃত্যের আঘাতে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া উড়িয়া যাক্!

(১৩১১)

শরৎ

ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রৌঢ়। তা'র যৌবনের টান সবটা আল্‌গা হয় নাই, ও-দিকে তা'কে মরণের টান ধরিয়াছে। এখনো সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার ঐ শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে; হায় রে, তোমার ঐ কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ঐ ভিজা পাতার বিবাগী হইয়া বাহির হওয়া! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসর-শয্যা তুমি রচিয়াছ। যা-কিছু ম্রিয়মাণ তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু 'গতস্য শোচনা' তুমি তা'রই অধিদেবতা।"

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়, আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তা'র কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলি-ফুলের গন্ধটি সেই কচি-গায়ের গন্ধের মতো। আকাশে আলোকে গাছেপালায় যা-কিছু রঙ দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রঙ, একেবারে তাজা।

প্রাণের একটি রঙ্ আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি করা লাল নীল সবুজ হ'ল্‌দে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রঙ নয়; তা কোমলতার রঙ। সেই রঙ্ দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে।

জন্তর কঠিন চর্ম্মের উপরে সেই প্রাণের রঙ্ ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রঙ্-বেরঙের লোমে ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষের গা-টিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেই জন্য কোমল। প্রাণ জিনিষটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ যখন, যা-আছে কেবল-মাত্র তাই আছে, তা'র চেয়ে আরো-কিছুর আভাস নাই তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে, তখন লাল নীল সকল রকম রঙই থাকিতে পারে কেবল প্রাণের রঙ্ থাকে না।

শরতের রঙ্টি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তা'র এই-হাসি, এই-কান্না। সেই হাসি-কান্নার মধ্যে কার্য্য-কারণের গভীরতা নাই, তাহা এম্নি হাল্কাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তা'র পায়ের দাগটুকু পড়ে না—জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলো ছায়া ভাই বোনের মতো কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসি-কান্না প্রাণের জিনিষ, হৃদয়ের জিনিষ নহে। প্রাণ জিনিষটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসি-কান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিষটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে,—তা'র

হাসি-কান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝর্‌ণা সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে। তা'র মধ্যে ছায়া-আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝর্‌ণাই উপত্যকায় যে-সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতায় ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে। তাই শরতের হাসি-কান্না কেবল আমাদের প্রাণ-প্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘ-নিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আট্‌কা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি চলি করে বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায়, শরতে তেম্‌নি মাটির দিকে। আকাশ-প্রাঙ্গণ হইতে তখন সভার আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের একপার হইতে আর-এক পার পর্য্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরত বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরত ফসল-ক্ষেতের ঋতু। এই ফসলের ক্ষেত একেবারে মাটির-কোলের জিনিষ। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোটো, এরা যে অল্পকালের জন্য আসে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া

তুলিতে হয়। সূর্য্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পান-সত্রের মতো—ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডুষ ভরিয়া সূর্য্য-কিরণ পান করিয়া লইয়া চলিয়া যায়—বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীতে এই সব ছোটোদের এই সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নীচে হা-হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তা'র পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবি-দাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, হে শরৎ, তুমি শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতের ক্ষণিক মিলন-শয্যা পাতিয়াছ। যে বর্ত্তমানটুকুর জন্য অতীতের চতুর্দ্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তা'রি মুখচুম্বন করিতেছ, তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দী-ভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছু দিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া,—তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই;—হাসির চন্দ্রকলা তা'র ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তা'র জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্ব্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমী-রাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, "বসন্ত

তা'র উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে!"—তিনি বলিতেছেন, "ফাল্গুনের মধ্যে মিলন-পিপাসিনীর যে রস ব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তপ্ত-নিশ্বাস-বিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লণ্ডভণ্ড অরণ্যের গায়ন সভায় তোমার ঝোড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারি মৃত্যুশোকের বিলাপ গান গাহিবে বলিয়া। তোমারি বিনাশের শ্রী তোমার সৌন্দর্য্যের বেদনা ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ!"

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে-শরৎ বাষ্পের ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরৎ, মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসিমুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাৎ আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি, পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, "তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধুয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।"
(১৩২২)

মেঘদূত

১

তা'র পাশেই আছি তবু নির্ব্বাসন।

বড়ো কাছে থাকার এই বিরহ, এত কাছে এক-জন আরেক-জনকে সবটা দেখ্‌তে পায় না।

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী ব'লেছিল?

সে ব'লেছিল "সেই মানুষ আমার কাছে এল, যে-মানুষ আমার দূরের।"

আর বাঁশি ব'লেছিল, "ধ'রলেও যাকে ধরা যায় না তা'কে ধ'রেছি, পেলেও সকল-পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।"

তা'র-পরে রোজ বাঁশি বাজে না কেন?

কেন-না, আধ-খানা কথা ভুলেছি। শুধু মনে রইল সে কাছে; কিন্তু সে যে দূরেও তা খেয়াল রইল না।

প্রেমের যে-আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে-আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দূরের চির-তৃপ্তি-হীন দেখাটা আর দেখা যায় না, কাছের পর্দ্দা আড়াল ক'রেছে।

দুই মানুষের মাঝে যে-অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত চুপকে বাঁশির সুর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।

সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেছে, প্রতিদিনের কাজে কর্ম্মে কথায় ভ'রে গিয়েছে, প্রতিদিনের ভয় ভাবনা কৃপণতায়।

২

এক-একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে হাওয়া দেয়, বিছানার 'পরে জেগে ব'সে বুক ব্যথিয়ে ওঠে, মনে পড়ে এই পাশের লোকটিকে তো হারিয়েছি।

এই বিরহ মিট্‌বে কেমন ক'রে, আমার অনন্তের সঙ্গে তা'র অনন্তের বিরহ?

দিনের শেষে কাজের থেকে ফিরে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সে কে? সে তো সংসারের হাজার লোকের মধ্যে এক-জন, তা'কে তো জানা হ'য়েছে, চেনা হ'য়েছে সে তো ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান এক-জন, সেই আমার একটি মাত্র? ওকে আমার নূতন খুঁজে পাই কোন্ কূলহারা কামনার ধারে?

ওর-সঙ্গে আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে, বন-মল্লিকার গন্ধে নিবিড় কোন্ কর্ম্মহীন সন্ধ্যার অন্ধকারে?

৩

এমন সময়ে নব-বর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্ব্ব-দিগন্তে এসে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে প'ড়ে গেল। মনে হ'ল প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।

আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার দূর-দুর্গম নির্ব্বাসন পার হ'য়ে যাক্।

কিন্তু তা-হ'লে তা'কে যেতে হবে, কালের উজান পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায়-ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে-দিনটি বিশ্বের চির-বর্ষা ও চির-বসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে র'য়ে গেল, কেতকী-বনের দীর্ঘ-নিশ্বাসে, আর শাল-মঞ্জরীর উতলা আত্ম-নিবেদনে।

নির্জ্জন দীঘির ধারে নারিকেল-বনের মর্ম্মর-মুখরিত বর্ষার আপন কথাটিকেই আমার কথা ক'রে নিয়ে প্রিয়ার কানে পৌছিয়ে দিক, যেখানে সে তা'র এলোচুলে গ্রন্থি দিয়ে, আঁচল কোমরে বেঁধে সংসারের কাজে ব্যস্ত।

৪

বহুদূরের অসীম আকাশ আজ বনরাজি-নীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হ'য়ে পড়্‌ল। কানে কানে ব'ল্‌লে, "আমি তোমারি।"

পৃথিবী ব'ল্‌লে, সে কেমন ক'রে হবে? তুমি-যে অসীম, আমি-যে ছোটো।"

আকাশ ব'ল্‌লে, "আমি তো চার-দিকে আমার মেঘের সীমা টেনে দিয়েছি।"

পৃথিবী ব'ল্‌লে, "তোমার-যে কত জ্যোতিষ্কের সম্পদ, আমার তো আলোর সম্পদ নেই।"

আকাশ ব'ল্‌লে, "আজ আমি আমার চন্দ্র সূর্য্য তারা সব হারিয়ে ফেলে এসেছি, আজ আমার একমাত্র তুমি আছ।"

পৃথিবী ব'ল্‌লে, "আমার অশ্রুভরা হৃদয় হাওয়ায় হাওয়ায় চঞ্চল হ'য়ে কাঁপে, তুমি-যে অবিচলিত।"

আকাশ ব'ল্‌লে, "আমার অশ্রুও আজ চঞ্চল হ'য়েছে দেখ্‌তে কি পাও নি? আমার বক্ষ আজ শ্যামল হ'লো তোমার ঐ শ্যামল হৃদয়টির মতো।"

সে এই ব'লে আকাশ-পৃথিবীর মাঝখানকার চির-বিরহটাকে চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

৫

সেই আকাশ পৃথিবীর বিবাহ-মন্ত্র-গুঞ্জন নিয়ে নব-বর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্ব্বচনীয় তাই হঠাৎ-

বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হ'য়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো রঙিন তা'র নীলাঞ্চল। তা'র কালো চোখের চাহনিতে মেঘ-মল্লারের সব মিড়-গুলি আর্ত হ'য়ে উঠুক। সার্থক হোক্ বকুল-মালা তা'র বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে'।

যখন ঝিল্লির ঝঙ্কারে বেণু-বনের অন্ধকার থর্ থর্ ক'র্‌ছে, যখন বাদল হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তা'র অতি-কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথ রাত্রে।

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬)

পায়ে-চলার পথ

১

এই তো পায়ে-চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়া-ঘাটের পাশে বটগাছ-তলায়; তা'র-পরে ও-পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চ'লে গেছে গ্রামের মধ্যে; তা'র-পরে তিসির ক্ষেতের ধার দিয়ে, আম-বাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্ম-দিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেছে জানিনে।

এই পথে কত মানুষ কেউ-বা আমার পাশ-দিয়ে চ'লে গেছে, কেউ-বা সঙ্গ নিয়েছে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল; কারো বা ঘোম্‌টা আছে, কারো বা নেই; কেউ-বা জল ভ'র্‌তে চ'লেছে, কেউ-বা জল নিয়ে ফিরে এল।

২

এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হ'য়ে আসে।

একদিন এই পথকে মনে হ'য়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখ্‌ছি কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চ'ল্‌বার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

নেবুতলা উজিয়ে, সেই পুকুর-পাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়াল-বাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটি-বারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, "এই যে।" এ পথ-যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখ্‌লুম, এই পথটি বহু বিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

যত কাল যত পথিক চ'লে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটি মাত্র ধূলি-রেখায় সংক্ষিপ্ত ক'রে এঁকেছে; সেই একটি রেখা চ'লেছে সূর্য্যোদয়ের দিক থেকে সূর্য্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আরেক সোনার সিংহদ্বারে।

৩

"ওগো পায়ে-চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার এই ধূলি-বন্ধনে বেঁধে নীরব ক'রে রেখো না। আমি তোমার ধূলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে-কানে বলো।"

পথ নিশীথের কালো পর্দ্দার দিকে তর্জ্জনী বাড়িয়ে চুপ ক'রে থাকে।

"ওগো পায়ে-চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়?"

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্য্যোদয়ের দিক থেকে সূর্য্যাস্তের দিক পর্য্যন্ত ইসারা মেলে রাখে।

"ওগো পায়ে চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে-সমস্ত চরণ-পাত একদিন পুষ্পবৃষ্টির মতো পড়েছিল আজ তা'রা কি কোথাও নেই?"

পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্ব্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব?

(আষাঢ়, ১৩২৬)

বাঁশি

বাঁশির বাণী চির-দিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা—প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চ'লেছে ; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেল্‌তে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারিনে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখ-দুখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর মনে হ'তে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কী ক'রে? কথায় তা'র কোনো জবাব নেই।

আজ ভোর-বেলাতেই উঠে শুনি, বিয়ে-বাড়িতে বাঁশি বাজছে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য ; অবহেলা অপমান অবসাদ ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবন যাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশির দৈব-বাণীতে এ-সব বার্ত্তার আভাস কোথায়?

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দ্দা একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হ'চ্চে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠন-তলে, তাই তা'র তানে তানে প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ল।

যখন সেখানকার মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম, তা'র গলায় সোনার হার, তা'র পায়ে দু'গাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরের আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন্ ঘরের বউ হ'য়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

(আশ্বিন, ১৩২৬)

সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নাম্‌ল সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্র-পারে তোমার প্রভাত হ'লো?

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠ্‌ছে রজনী-গন্ধা, বাসর-ঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নব-বধূর মতো; কোন্‌খানে ফুট্‌ল ভোর-বেলাকার কনক-চাঁপা?

জাগল কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল প'ড়্‌ল, সেখানে জান্‌লা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে প'ড়েছে, পূবের দিকে ওদের মুখ; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারাণীর কড়ি এখনো ফুরোয়-নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জান্‌লায় জান্‌লায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ তাকিয়ে; রাস্তা ওদের সাম্‌নে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধ'র্‌লে, ব'ল্‌লে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।" ওদের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠ্‌ল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হ'লো।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সাম্‌নের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি ক'র্‌ছে; ব'ল্‌তে

ব'ল্‌তে কথা বেধে যায়, তা'র পরে চুপ ক'রে থাকে; তা'র পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্য্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্ব্বাদ ক'রে চ'লে যাক্।

(আশ্বিন, ১৩২৬)

ধর্ম্ম

উৎসবের দিন

সকালবেলায় অন্ধকার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হয়, অমনি বনে-উপবনে পাখীদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে-উৎসব কিসের উৎসব? কেন এই সমস্ত বিহঙ্গের দল নাচিয়া কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠে? তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখীরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণবান্, গতিমান্, চেতনাবান্, পক্ষীজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সঙ্গীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের যেখানে অব্যাহতশক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মূর্ত্তিমান্ উৎসব। সেইজন্য হেমন্তের সূর্য্যকিরণে অগ্রহায়ণের পক্ক-শস্যসমুদ্রে সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে—সেইজন্য আম্র-মঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে।

মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে,—বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না—যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন না—যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে

ক্রীড়াপুত্তলীর মতো ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে ;—সেদিন তো আমরা জড়ের মতো, উদ্ভিদের মতো সাধারণ জন্তুর মতো—সেদিন তো আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্ব্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করি না—সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের ? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কর্ম্মে ক্লিষ্ট—সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না—সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না—সেদিন আমাদের ঘরে সংসার-চক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সঙ্গীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

মানুষের মধ্যে কী আশ্চর্য্যশক্তি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে! আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কোন্ ঊর্দ্ধে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! জ্ঞানী জ্ঞানের কোন দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, কর্ম্মী কর্ম্মের কোন অশ্রান্ত দুঃসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছে ? জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ আমরা সে শক্তির গৌরব স্মরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব।

মানুষের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজন-সাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু যেখানটা মানুষের সমস্ত আবশ্যক সীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম, মহোচ্চতম শক্তি

সর্ব্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব অদ্যকার উৎসবে আনন্দ-সঙ্গীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, ভয় শোকের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। আজ অতীত ভবিষ্যতের সুমহান্ মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরন্তনশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক করিব।

মানুষের কর্ম্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানে আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্য্যে আপনাকে নির্ব্বিশেষে সর্ব্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র,ইহাই ঐশ্বর্য্য। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবযে অপরিমাণং ॥
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥
তিঠ্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্দ্ধদিকে, অধোদিকে, চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কী দাঁড়াইতে, কী চলিতে, কী বসিতে, কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের

কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে—আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্ম-বিহার—এই সমস্ত-আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট্ অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্য্যে, মঙ্গলসাধনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র, তাহা আমরা সকলেই জানি—সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না—ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে—ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্য্যাপ্ত প্রাচুর্য্য—ইহা চক্রবর্ত্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে একমুহূর্ত্তে হীনপ্রভ করিয়া-দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, বিস্মৃত, ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি, ফাল্গুনের পুষ্পপর্য্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি, মহাসমুদ্রের নীলাম্বু-নৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান করো! বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান করো! আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরস সম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধমাত্র মাধুর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে—আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তি সংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব, প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য হইতে উদ্বোধিত করো, প্রতিদিনের নির্বীর্য্য নিশ্চেষ্টতা হইতে, আরাম আবেগ হইতে উদ্ধার করো। যে কঠোরতায় যে উদ্যমে যে আত্ম-বিসর্জ্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করো! দূর করো সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন, সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, সমস্ত অপবিত্র আয়োজন—মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী চূড়া-বিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও। যেখানে, সেই কঠিনক্ষেত্রে, সেই রিক্ত নির্জ্জনতার মধ্যে, সেই বহুদিনের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব প্রভু!

দাও হস্তে তুলি'
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ! অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে!
করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়! পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার! ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে!

(মাঘ, ১৩১১)

দুঃখ

দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব একেবারে এক সঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই ত দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন? এটা একেবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্য্যকারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া?

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিচ্ছেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ-কথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

সেই জন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেই জন্যই এ-জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেই জন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল

আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা-কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে, তখন নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই তো সব বলা হইল না—এমন কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য শক্তি ও আশ্চর্য সৌন্দর্যের কী বলা হইল! সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন সঙ্গীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ-তো কেবলমাত্র জল ও মাটি—"মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ"—কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কী! তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, কষাহত কালো ঘোড়ার মসৃণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে; তারপর সেই জল-স্থল আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল—সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধুলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ-যে অপরূপের দর্শন। ইহা ত শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে, ইহাই বীণার সঙ্গীত। এই সঙ্গীতেই আনন্দের পরিচয়—সেই আনন্দরূপমমৃতম্।

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে কতদূরেই

ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্য-সাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ, তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্য সহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

এ-কথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কী করিয়া?

কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনোদিনই আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখিতে পায় নাই, হঠাৎ কি কখনই বলিয়া উঠে নাই—বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি, আর কখনো সংশয় করিব না? পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শুভমুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই, সেই দিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই "যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম", অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন দেবতাকে পূজা করিব! সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মানুষ দুঃখকেই পূজা করিয়া আসিয়াছে—আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।

অতএব দুঃখকে আমরা দুর্ব্বলতাবশত খর্ব্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ-কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ, দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পদ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন সে-ত তাহার নহে—সেই সমস্তই বিশ্বেশ্বরের। কিন্তু দুঃখ-যে তাহার নিতান্তই আপনার।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি? তাঁহারই ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখ-ধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি—হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্দ্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জ্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে, তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি; হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি; সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।

আমরা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে আমরা সুখদুঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিত্তকে অসাড় করিয়া ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেরূপ

উদাসীন হওয়া হয়ত অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু সুখ-দুঃখ ত কেবলি নিজের নহে, তাহা-যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই তো সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।

অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে বজ্রের আঘাতে কত জাতি, কত রাজ্য, কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে; যেখানে সে মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে, এবং মানুষের চেষ্টাকে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ-মারী অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায়; যেখানে রক্ত-সরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধর-মূর্তিতে সুতীক্ষ্ণ লাঙল দিয়া সে মানব-হৃদয়কে বারম্বার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান্ করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না—সেই পরিত্রাণই মৃত্যু —সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব-সমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব-সংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা-কিছু নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহার তাহা সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্ত্তি দেখিয়াছে দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্য্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

উপনিষৎ বলিয়াছেন—"স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"। তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-একদিক দিয়া বলা

হইয়াছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"। আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে! "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ!" কৃষক চাষ করিয়া যে-ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়ো, তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা ত বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ, এবং প্রেমিকের প্রিয় সাধনাও তাই।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্ব্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্য্যই ঈশ্বরের মূর্ত্তি, সংসারসুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেই জন্যই এই সকল দুর্ব্বলচিত্ত সুখের পূজারীগণ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের, মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ, বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ তুমিই বিপদ; হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। তুমিই

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ॥

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎবদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ—সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া হে বিষ্ণু তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্ব্বলভাবে নিজের আরামের, নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি—তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ—সেই যে উদ্ধারের পথ সে ত আরামের পথ নহে সে-যে পরম দুঃখেরই পথ। মানুষের অন্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে "আবিরাবীর্ম্মএধি, হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও"—হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও। এ প্রকাশ তো সহজ নহে! এ-যে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য-যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু-যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মানুষের জ্ঞানে, মানুষের কর্ম্মে, মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে বলিয়াছেন "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"—হে রুদ্র, তোমার-যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করো। হে রুদ্র, তোমার-যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে,—তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ কখন্ দেখি? যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে

মত্ত, খ্যাতির অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত যখন আমরা নিরাপদ অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত, তখন ? নহে, নহে, কদাচ নহে।—যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্ম্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়া মান্য না করি—তখনই বাধায় বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্র্যে দুর্য্যোগে, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে। তখন দুঃখ এবং মৃত্যু, বিঘ্ন এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা সুখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল নাই, আলস্যে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভয়ঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর, হে শঙ্কর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব—কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক, এই আশীর্ব্বাদ করো। যে-ব্যক্তি ও যে-জাতি আপন শক্তি ও ধন সম্পদকেই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন একমুহূর্ত্তে জাগাইয়া তুলিবে, তখন হে রুদ্র, সেই উদ্ধত ঐশ্বর্য্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে-জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে, তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি—এবং যে-ব্যক্তি ও যে-জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জ্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ দুর্দ্দিনকে আমরা যেন সমস্ত জীবন

সমর্পণ করিয়া সম্মান করি—এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

"আবিরাবীর্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্!" দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হোক্, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হোক্, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হোক্। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই দুর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে।

(১৩১৪)

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে, জগতে আর যত-কিছু কথা আছে সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিক-মতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে তবে সে এই শ্রাবণের ধারা-পতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্ ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর ক'রে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্ম্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। বারবার তাকে ধ্বনিত করে তুল্‌ছে—শিশু তার নূতন-শেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ কর্‌তে থাকে, সেই রকম—তার শ্রান্তি নেই, শেষ নাই, তার আর বৈচিত্র্য নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই-যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুন্‌ছে—আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে—সেও কিছু একটা বল্‌তে চাচ্ছে।—ঐ রকম খুব বড়ো করেই বল্‌তে চায়, ঐ রকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বল্‌তে চায়—কিন্তু

সে ত কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে; জলের কল্লোলে, বনের মর্ম্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা-কিছু কথা সে তো স্পষ্ট কথায় নয়—সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এই জন্যে প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্ব্বচনীয়ের আভাসে-ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিষটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ; আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেই জন্যে কথায় মানুষ মনুষ্য-লোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এই জন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিষ করে তোলে, তার বেদনা প্রভাত সন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রাকৃতিক চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে। প্রকৃতি হতে রঙ এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুলছে, প্রকৃতি হতে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুলছে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মানুষের মনের জিনিষগুলি বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্কোচ এবং নিত্য-ব্যবহারের মলিনতা

ঘুচিয়ে দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন সরস, নবীন এবং মহৎ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘন বর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিল্‌তে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে আঘাত করছে। আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাট্‌বে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

তাই আমি বল্‌ছি আমার কথা আজ থাক্‌। সংসারের কাজ-কর্ম্মের সীমাকে, মনুষ্য-লোকালয়ের বেড়াকে একটুখানি সরিয়ে দাও, আজ এই আকাশ-ভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে নাও।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র! বাহিরে তার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর-এক মূর্ত্তি।

একটা দৃষ্টান্ত দেখো—গাছের ফুল। তাকে দেখ্‌তে যতই সৌখীন হোক্‌ সে নিতান্তই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজ-সজ্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হোক্‌ তাকে ফল ফলাতেই হবে, নইলে তরুবংশ পৃথিবীতে টিঁক্‌বে না, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যাবে। এই জন্যেই তার রঙ, এই জন্যেই তার গন্ধ। মৌমাছির পদ-রেণু-পাতে যেম্‌নি তার পুষ্পজন্ম সফলতা লাভের উপক্রম করে, অম্‌নি সে আপনার রঙীন পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধুগন্ধ নির্ম্মমভাবে বিসর্জ্জন দেয়; তার সৌখীনতার সময় মাত্র নেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রকৃতির বাহির বাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে হন্‌হন্‌ করে ছুটে চলেছে,—যেখানে একটু বাধা পায় সেখানে আর মাপ

নেই, সেখানে কোনো কৈফিয়ৎ কেউ গ্রাহ্য করে না, সেখানেই তার কপালে ছাপ পড়ে যায় "নামঞ্জুর", তখনি বিনা বিলম্বে খসে ঝরে শুকিয়ে সরে পড়্‌তে হয়। প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার ঐ ফুলটিকে যে দেখ্‌ছ, অত্যন্ত বাবুর মতো গায়ে গন্ধ মেখে রঙীন পোষাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্যে এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়—বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে-যে একটু দোলা খাবে এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে তখন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মূর্তিমান। এই একই জিনিষ বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, তুমি ভুল বুঝছ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য কাজ করা—তার সঙ্গে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের যে অহেতুক সম্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ সে তোমার নিজের পাতানো।

আমাদের হৃদয় উত্তর করে, কিছুমাত্র ভুল বুঝিনি। ঐ ফুলটি কাজের পরিচয়-পত্র নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্য্যের পরিচয়-পত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে আঘাত করে—একদিকে আসে বন্দীর মতো, আর একদিকে আসে মুক্ত-স্বরূপে—এর একটা পরিচয়ই যে সত্য আর অন্যটা সত্য নয় একথা কেমন করে মান্‌ব? ঐ ফুলটি গাছপালার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কার্য্যকারণসূত্রে ফুটে উঠেছে একথাটাও সত্য কিন্তু সে তো বাহিরের সত্য, আর অন্তরের সত্য হচ্ছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

ফুল মধুকরকে বলে তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আন্‌ব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি—আবার

মানুষের মনকে বলে, আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আন্‌ব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি। মধুকর ফুলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে কিছুমাত্র ঠকেনি, আর মানুষের মনও যখন বিশ্বাস করে তাকে ধরা দেয় তখন দেখ্‌তে পায় ফুল তাকে মিথ্যা বলেনি।

ফুল যে কেবল বনের মধ্যেই কাজ কর্‌ছে তা নয়—মানুষের মনের মধ্যেও তার যেটুকু কাজ, তা সে বরাবর করে আস্‌ছে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কী? প্রকৃতির দরজায় যে-ফুলকে যথা-ঋতুতে যথাসময়ে মজুরের মতো হাজরি দিতে হয় আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজদূতের মতো উপস্থিত হয়ে থাকে।

সীতা যখন রাবণের ঘরে একা বসে কাঁদছিলেন তখন একদিন যে দূত কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল সে রামচন্দ্রের আংটি সঙ্গে করে এনেছিল। এই আংটি দেখেই সীতা তখনি বুঝতে পেরেছিলেন এই দূতই তাঁর প্রিয়তমের কাছে থেকে এসেছে; তখনই তিনি বুঝলেন রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উদ্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্ব্বাসিত হয়ে আছি, রাক্ষস আমাদের কেবলি বল্‌ছে, আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।

কিন্তু সংসারের পরের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে, আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্নতায় দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, তিনি তোমাকে একমুহূর্ত্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার কর্‌বেন। তিনি তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারবে না।

যদি তখন আমরা জেগে থাকি ত তাকে বলি তুমি-যে তাঁর দূত তা আমরা জান্‌বো কী করে? সে বলে, এই দেখো আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রঙ, এর কেমন শোভা!

তাই তো বটে। এ-যে তাঁরি আংটি, মিলনের আংটি। আর সমস্ত ভুলিয়ে তখনি সেই আনন্দময়ের আনন্দ-স্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তখনি আমরা বুঝ্‌তে পারি এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয়—এর বাহিরে আমার মুক্তি আছে—সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবলমাত্র রঙ, কেবল-মাত্র গন্ধ, কেবল-মাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির পথ চেন্‌বার উপায়-চিহ্ন—মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য্য, তাই বিনা-প্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙীন কালীতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বল্‌ছিলুম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হোক্ না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা-কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানাঘরের কলশব্দ সঙ্গীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্য্যকারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্ ঝম্ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের—বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি—একই সময়ে একদিকে তার কর্ম্ম আর একদিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই-যে মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্ত সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে এই অন্ধকার সভায় আমাদের কাছে এ কথাটির কোনো আভাস-মাত্র সে দিচ্ছে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে, কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘ-মল্লারের সুরে কেবলি করুণ গান জেগে উঠছে—

তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া,
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, ওরে, তুই যে বিরহিণী—তুই বেঁচে আছিস কী করে, তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে ?

সেই চির-দিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।

আমরা যে তাঁরই বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেন না বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া যেমন আগুন জলার আরম্ভ, বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।

খবর আমাদের দেয় কে ? ঐ যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করছে, তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, যারা পায়ে শিকল দিয়ে

একজনের সঙ্গে আর একজন বাঁধা থেকে দিন রাত্রি কেবল বোবার মতো কাজ করে যাচ্ছে—তারাই। যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অম্‌নি দেখ্‌তে পাই এ-যে বিরহের বেদনা-গান, এ-যে মিলনের আহ্বান-সঙ্গীত। যে-সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না সে-সব খবরকে এরাই তো চুপি চুপি বলে যায়—এবং মানুষ কবি সেই সব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায়, কতকটা সুরে, বেঁধে গাইতে থাকে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আজ কেবলি মনে হচ্ছে এই-যে বর্ষা, এ-তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গীহীন বিরহ-সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বল্‌ছে—"কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।" তবু এই অন্ধকারের এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোনো বিকশিত বনের সজল গন্ধ আস্‌ছে, এমন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য—যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুল্‌ছে তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আস্‌ছে।

বিরহ সন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদ্‌তে হতো যে, "কেমন করে তোর দিন-রাত্রি কাট্‌বে"—তা হলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্য্যন্ত বাঁচ্‌ত না;—কিন্তু শুধু কেমন করে কাট্‌বে নয় তো—"কেমন করে কাট্‌বে হরি বিনে দিনরাতিয়া"—সেই জন্যে "হরি বিনে" কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র

বর্ষণ! চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চির-জীবনের ধন কেউ আছে—তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে সে আছে—বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে—সেই হরিবিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া! এই জীবনব্যাপী বিরহে যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ-সুরে বাঁশি বাজাচ্ছেন সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া!
(শ্রাবণ, ১৩১৭)

পাপের মার্জ্জনা

আমাদের প্রার্থনা সকল সময়ে সত্য হয় না, অনেক সময়ে মুখের কথা হয়—কারণ চারিদিকে অসত্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকি বলে আমাদের বাণীতে সত্যের তেজ পৌঁছয় না ! কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে, জীবনের মধ্যে এমন এক-একটি দিন আসে, যখন সমস্ত মিথ্যা এক মুহূর্ত্তে দগ্ধ হয়ে গিয়ে এমনি একটি আলোক জেগে ওঠে যার সামনে সত্যকে অস্বীকার কর্‌বার উপায় থাকে না। তখনই এই কথাটি বারবার জাগ্রত হয়—'বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।' হে দেব, হে পিতা, বিশ্বপাপ মার্জ্জনা কর।

আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা কর্‌তে পারি না,—আমাদের পাপ ক্ষমা কর; কারণ তিনি ক্ষমা করেন না, সহ্য করেন না। তাঁর কাছে এই প্রার্থনাই সত্য প্রার্থনা—তুমি মার্জ্জনা কর। যেখানে যত কিছু পাপ আছে, অকল্যাণ আছে, বারম্বার রক্তস্রোতের দ্বারা অগ্নি-বৃষ্টির দ্বারা সেখানে তিনি মার্জ্জনা করেন। যে-প্রার্থনা ক্ষমা চায় সে দুর্ব্বলের ভীরুর প্রার্থনা, সে প্রার্থনা তাঁর দ্বারে গিয়ে পৌঁছবে না।

আজ এই-যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে, এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে—'বিশ্বানি দুরিতানিপরাসুব'—বিশ্বপাপ মার্জ্জনা কর। আজ যে-রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, সে যেন ব্যর্থ না হয়—রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনি পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে, তখনি তো তাঁর মার্জ্জনার দিন আসে।

আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহন-যজ্ঞ হচ্ছে, তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক—'বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব।' আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।

আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফে যে একটু আধটু খবর পাই, তার পশ্চাতে কী অসহ্য সব দুঃখ রয়েছে—আমরা কি তা চিন্তা করে দেখি? যে হানাহানি হচ্ছে, তার সমস্ত বেদনা কোন্‌খানে গিয়ে লাগ্‌ছে? ভেবে দেখ, কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে। এই জন্যই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠুর; কারণ যেখানে বেদনা-বোধ সব চেয়ে বেশি, যেখানে প্রীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই-যে গিয়ে বাজে। যার হৃদয় কঠিন, সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারণ সে যদি বেদনা পেত, তবে পাপ এমন নিদারুণ হতেই পারত না। যার হৃদয় কোমল, যার প্রেম গভীর, তাকেই সমস্ত বেদনা বইতে হবে। এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের রক্তপাত কঠিন নয়, রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয়, কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অশ্রুবিসর্জ্জন কর্‌ছে তারি আঘাত সব চেয়ে কঠিন।

সেইজন্য এক এক সময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে—যেখানে পাপ, সেখানে কেন শাস্তি হয় না? সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে? কিন্তু এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই—সমস্ত মানুষ-যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন কর্‌তে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্ব্বলকে সহ্য কর্‌তে হয়। মানুষের সমাজে এক জনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ-যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।

মানুষের এই ঐক্যবোধের মধ্যে যে-গৌরব আছে তাকে ভুল্‌লে

চল্‌বে না। এইজন্যই আমাদের সকলকে দুঃখভোগ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না—সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই কর্‌তে হবে। যে-হৃদয় প্রীতিতে কোমল, দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ কর্‌বে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না।—সে চেয়ে দেখ্‌বে দুর্য্যোগের রাত্রে দূর দিগন্তে মশাল জ্বলে উঠেছে, বেদনায় মেদিনী কম্পিত করে রুদ্র আসছেন—সেই বেদনার আঘাতে তার হৃদয়ের সমস্ত নাড়ী ছিন্ন হয়ে যাবে। যার চিত্ততন্ত্রীতে আঘাত কর্‌লে সবচেয়ে বেশি বাজে, পৃথিবীর সমস্ত বেদনা তাকেই সবচেয়ে বেশি করে বাজ্‌বে।

তাই বল্‌ছি যে, সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে এক করে যে-একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম আছেন, তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হতেন তবে বেদনার এই গতি কখনই এমন বেগবান্ হতে পারত না। ধনীদরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চির-জাগ্রত আছেন বলেই এক জায়গার বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠছে। এই কথাটি আজ বিশেষভাবে অনুভব কর।

তাই একথা আজ বল্‌বার কথা নয় যে, অন্যের কর্ম্মের ফল আমি কেন ভোগ করব? হাঁ, আমি ভোগ করব, আমি নিজে একাকী ভোগ করব, এই কথা বলে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি কর, তপস্যা কর, দুঃখকে গ্রহণ কর। তোমাকে-যে নিজের পাপের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ কর্‌তে হবে, নিজের রক্তপাত কর্‌তে হবে, দুঃখে দগ্ধ হয়ে হয় ত মর্‌তে হবে। কারণ তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্ম্মল থাক্‌বে কেমন করে, প্রাণবান্ হয়ে উঠবে কেমন করে? ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে—সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই 'যদ্‌ভদ্রং তৎ'—যা ভদ্র তাই আসবে। ওরে তপস্বী, দুঃসহ

দুর্ভর দুঃখভারে তোমার হৃদয় একেবারে নত হয়ে যাক্—তাঁর চরণে গিয়ে পৌঁছোক! 'নমস্তেঽস্তু' বল, পিতা তুমি-যে আছ সে কথা এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার কর। তোমার প্রেম নিষ্ঠুর—সেই নিষ্ঠুর প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে সব অপরাধ দলন করুক। 'পিতা নো বোধি'—আজই তো সেই উদ্বোধনের দিন। আজ পৃথিবীর প্রলয়-দাহের রুদ্র আলোকে পিতা তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয় হাহাকারের উর্দ্ধে স্তূপাকার পাপকে দগ্ধ করে সেই দহন দীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ, তুমি জেগে রয়েছ। তুমি আজ ঘুমতে দেবে না, তুমি আঘাত করছ প্রত্যেকের জীবনে কঠিন আঘাত। যেখানে প্রেম আছে জাগুক, যেখানে কল্যাণের বোধ আছে জাগুক—সকলে আজ তোমার বোধে উদ্বোধিত হয়ে উঠুক। এই এক প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা তুমি সকল আঘাতকে নিরস্ত কর। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুঞ্জীভূত—তুমি আজ সেই পাপ মার্জ্জনা কর। দুঃখের দ্বারা মার্জ্জনা কর, রক্তস্রোতের দ্বারা মার্জ্জনা কর, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা মার্জ্জনা কর।

এই প্রার্থনা—সমস্ত মানবচিত্তের এই প্রার্থনা আজ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগ্রত হোক। 'বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব।' বিশ্বপাপ মার্জ্জনা কর। এই প্রার্থনাকে সত্য করতে হবে—শুচি হতে হবে, সমস্ত হৃদয়কে মার্জ্জনা করতে হবে। আজ সেই তপস্যার আসনে পূজার আসনে উপবিষ্ট হও। যে-পিতা সমস্ত মানব সন্তানের দুঃখ গ্রহণ করছেন, যাঁর বেদনার অন্ত নেই প্রেমের অন্ত নেই—যাঁর প্রেমের বেদনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে সেই তাঁর প্রেমের বেদনাকে আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করি।

(৯ ভাদ্র, ১৩২১)

ছিন্ন-পত্র

সূর্য্যাস্ত

পতিসর, ১৮৯১। আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বেঁধেছি। আমি এখন যেখানে এসেছি এ জায়গায় অধিকন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না। চারিদিকে কেবল মাঠ ধূ ধূ করছে—মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের গোড়াগুলিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিনের পর সূর্য্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেড়িয়েছিলুম। সূর্য্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারিদিকে কী-যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বল্‌ব। বহুদূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল। সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল, নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল, মনে হল ঐখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখানে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যা-তারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জ্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে বধূর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে; এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন গুন স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়—একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো। আমার বাঁ-পাশে ছোট্টো নদীটি দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে এঁকে বেঁকে খুব অল্প দূরেই দৃষ্টি-পথের বার হয়ে গেছে,

জলে ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিল না, কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমূর্ষু হাসির মতো খানিকক্ষণের জন্যে লেগে ছিল। যেমন প্রকাণ্ড মাঠ, তেম্‌নি প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা; কেবল একরকম পাখী আছে তারা মাটিতে বাসা করে থাকে; সেই পাখী, যত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগ্‌ল তত আমাকে তার নিরালা বাসার কাছে ক্রমিক আনাগোনা করতে দেখে ব্যাকুল সন্দেহের স্বরে টী টী করে ডাকতে লাগ্‌ল। ক্রমে এখানকার কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ঈষৎ ফুটে উঠল।

পৃথিবী

কালীগ্রাম, জানুয়ারী ১৮৯১; ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি! ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা-দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য-হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে

ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে—'আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই ; আমি ভালোবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে, আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে পারিনে, জন্ম দিই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।" এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি ; এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্ব্বদা চিন্তাকাতর বলেই।

শীতের সকাল

শিলাইদহ, ফেব্রুয়ারী ১৮৯১। কাছারির পর-পারের নির্জ্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারিদিকটা এম্‌নি সুন্দর ঠেক্‌ছে সে আর কী বল্‌ব। অনেক দিন পরে আমার এই বড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখাসাক্ষাৎ হল। সেও বল্লে 'এই যে!' আমিও বল্লুম 'এই যে!' তার-পরে দুজনে পাশাপাশি বসে আছি আর কোনো কথাবার্ত্তা নেই। জল ছল্‌ছল্ কর্‌ছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক্‌চিক্ কর্‌ছে—বালির চর ধূ ধূ কর্‌ছে, তার উপর ছোটো ছোটো বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুর-বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ, এবং ঝাউ ঝোপ থেকে দুটো-একটা পাখীর চিক্ চিক্ শব্দ সবশুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব। খুব লিখে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে—কিন্তু আর কিছু নিয়ে নয়, এই জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্ছে রোজই ঘুরে ফিরে এই কথাই লিখতে হবে ; কেননা আমার এই একই নেশা, আমি বারবার এই এককথা নিয়েই বকি। বড়ো বড়ো নদী কাটিয়ে আমাদের বোটটা একটা ছোটো নদীর মুখে প্রবেশ কর্‌ছে। দুইধারে

মেয়েরা স্নান করছে, কাপড় কাচ্‌ছে, এবং ভিজে কাপড়ে এক মাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসী নিয়ে ডানহাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে; ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করছে; এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাচ্ছে—'একবার দাদা বলে ডাকরে লক্ষ্মণ।' উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে অদূরবর্ত্তী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাচ্ছে। ছোটো নদীতে বড়ো বেশি নৌকো নেই; দুটো একটা ছোটো ডিঙি শুক্‌নো গাছের ডাল এবং কাটকুটো বোঝাই নিয়ে শ্রান্তভাবে ছপ্ ছপ্ দাঁড় ফেলে চলেছে—ডাঙায় বাঁশের উপর জেলেদের জাল শুকোচ্ছে—পৃথিবীর সকালবেলার কাজকর্ম্ম খানিক-ক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে আছে।

গ্রামের মেয়ে

শাজাদপুর, ৪ঠা জুলাই ১৮৯১। আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকা চুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্ব্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্ট-পুষ্ট হওয়াতে চোদ্দো পনেরো দেখাচ্ছে। বেশ কাল অথচ বেশ দেখ্‌তে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরলভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসঙ্কোচে কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়েচেয়ে দেখতে লাগ্‌ল। তার মুখখানিতে কিছু যেন নির্ব্বুদ্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষত আধা-ছেলে

আধা-মেয়ের মতো হয়ে আরো একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মতো আত্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারি নতুনরকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে যে এ-রকম ছাঁদের 'জনপদবধূ' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করিনি। অবশেষে যখন যাবার সময় হল তখন দেখ্‌লুম আমার সেই চুল-ছাঁটা গোলগাল হাতে-বালা-পরা উজ্জ্বল সরল মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তুল্‌লে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাঁড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক-চোক মুছতে লাগ্‌ল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। যে গেল সে বোধ হয় এই বেচারির দিদিমণি। এর পুতুলখেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টমি কর্‌লে মাঝে মাঝে সে একে টিপিয়ে দিত। সকাল বেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগ্‌ল। সকালবেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ! এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। বিদায়কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরো একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো—তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া—যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী কিন্তু

ভেবে দেখ্‌তে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্যি—বিস্মৃতি সত্য নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এবং এক-একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জান্‌তে পারে, এই ব্যথাটা কী ভয়ঙ্কর সত্য। জান্‌তে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেউ থাকে না—এবং সেইটে মনে কর্‌লে মানুষ আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেবল যে থাক্‌ব না তা নয় কারো মনেও থাকবে না।

পোষ্ট মাষ্টার

শাজাদপুর, ২৯শে জুন ১৮৯২। কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেণ্ট করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্ত্তে এখানকার পোষ্টমাষ্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোষ্টমাষ্টারের দাবী ঢের বেশি। আমি তাঁকে বল্‌তে পার্‌লুম না—'আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে'—বল্‌লেও সে লোকটি ভাল বুঝ্‌তে পার্‌তেন না। অতএব পোষ্টমাষ্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় দিতে হল। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোষ্টআপিস্‌ ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখ্‌তে পেতুম, তখনি আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোষ্টমাষ্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে-গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোষ্টমাষ্টার বাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক্‌ এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানা রকম গল্প করে যান, আমি চুপ

করে বসে শুনি। ওরি মধ্যে ওঁর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।

পোষ্টমাষ্টার চলে গেলে সেইরাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম্। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর চেহারা রাজারা বসে গেছেন—এমন সময় শঙ্খ এবং তূরীধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ পরে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানের সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এম্‌নি সুন্দর লাগে! তার পরে সুনন্দা এক এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর। যাকে ত্যাগ করছেন তাকে-যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে! সকলেই রাজা, সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে-যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে, এই অবশ্য-রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য্য থাকৃত না।

বর্ষার নদী

শিলাইদা, ২১শে জুলাই ১৮৯২। কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁছেছিলুম, আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি। নদীর যে রোখ্! যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগর্ব্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে—এই ক্ষেপা নদীর উপর চড়ে আমরা দুল্‌তে দুল্‌তে চলেছি। এর মধ্যে ভারি একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে কী আর বল্‌বো! ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হতে পারছে না, ভারি একটা যৌবনের মত্ততার ভাব। এ তবু গড়ই নদী, এখান থেকে আবার

পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে—তার বোধ হয় আর কূল-কিনারা দেখ্‌বার যো নেই, সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ হয়ে ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, আর কিছুর মধ্যে থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্ত্তি মনে হয়—নৃত্য করছে, ভাঙ্‌ছে এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বল্‌ছিল নূতন বর্ষায় পদ্মার খুব 'ধার' হয়েছে। 'ধার' কথাটা ঠিক; তীব্রস্রোত যেন চক্‌চকে খড়্গের মতো—পাৎলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়—প্রাচীন ব্রিটন্‌দের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা—দুইধারের তীর একেবারে অবহেলে ছারখার করে দিয়ে চলেছে। /

পৃথিবীর টান

শিলাইদা, ২০শে আগষ্ট ১৮৯২। রোজ সকালে চোখ চেয়েই আমার বাঁ দিকে জল এবং ডান দিকে নদীতীর সূর্য্যকিরণে প্লাবিত দেখ্‌তে পাই। এখানকার রৌদ্রে আমার মন ভারি উদাসীন হয়ে যায়। এর-যে কী মানে ঠিক ধর্‌তে পারিনে, এর সঙ্গে-যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে। এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার সবুজ ঘাস উঠ্‌ত, শরতের আলো পড়্‌ত, সূর্য্য-কিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি-উত্তাপ উত্থিত হতে থাক্‌ত—আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশদেশান্তরের জলস্থলপর্ব্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাক্‌তুম, তখন শরৎ-সূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাক্‌ত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার

এই-যে মনের ভাব এ যেন প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্য্য-সনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্ছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছা করে সেটা ভাল করে প্রকাশ কর্‌তে—কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পার্‌বে না। কী একটা কিম্ভূত রকমের মনে কর্‌বে।

গ্রাম্য সাহিত্য

পতিসর, ১১ই আগষ্ট ১৮৯৩। অনেকগুলো বড় বড় বিলের মধ্যে দিয়ে আস্‌তে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারি অদ্ভুত—কোনো আকার আয়তন নেই, জলে জলে একাকার, পৃথিবী সমুদ্রগর্ভ থেকে নতুন জেগে ওঠবার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই—খানিকটা জল খানিকটা মগ্নপ্রায় ধানক্ষেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাস্‌ছে—পানকৌড়ী সাঁতার দিচ্ছে—জাল ফেল্‌বার জন্যে বড় বড় বাঁশ পোঁতা, তারি উপর কটা রঙের বড় বড় চিল বসে আছে। দ্বীপের মতো অতিদূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে—যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী। দুধারে গ্রাম, পাটের ক্ষেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন-যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার যো নেই।

ঠিক সূর্য্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আস্‌ছিলুম একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলি ছোক্‌রা ঝপ্‌ ঝপ করে দাঁড় ফেল্‌ছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

"যোবতী, ক্যান্ বা করো মন্ ভারি ?
পাব্‌না থাক্যে আন্যে দেবো ট্যাকা দামের মোটরি।"

স্থানীয় কবিটি যে-ভাব অবলম্বন করে সঙ্গীত রচনা করেছেন আমরাও ও-ভাবের ঢের লিখেছি কিন্তু ইতরবিশেষ আছে।—আমাদের যুবতী মন ভারি কর্‌লে তৎক্ষণাৎ জীবনটা, কিম্বা নন্দনকানন থেকে পারিজাতটা এনে দিতে প্রস্তুত হই—কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বল্‌তে হবে, অল্প ত্যাগস্বীকারেই যুবতীর মন পায়। মোটরি জিনিসটা কী তা বলা আমার সাধ্য নয়, কিন্তু তার দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে খুব বেশি দুর্মূল্য নয়, এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। গানটা শুনে বেশ মজার লাগ্‌ল—যুবতীর মন ভারি হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক কিন্তু দেশ কাল পাত্র বিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য্য আছে—আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবি-ভ্রাতার রচনাগুলিও এই গ্রামের লোকের সুখ দুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।

হাতী

পতিসর, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪। যে-পারে বোট লাগিয়েছি এপারে খুব নির্জ্জন। গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধূ ধূ করছে, নদীর ধারে ধারে খানিকটা করে শুক্‌নো ঘাসের মতো আছে সেই ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোটাকতক মোষ চ'রে বেড়াচ্ছে। আর আমাদের দুটো হাতী আছে, তারাও এপারে চর্‌তে আসে। তাদের দেখ্‌তে বেশ মজা লাগে, একটা পা উঠিয়ে ঘাসের গোড়ায় দুচার বার একটু একটু ঠোকর মারে, তারপরে শুঁড় দিয়ে টান মার্‌তেই বড়ো বড়ো ঘাসের

চাপড়া একেবারে মাটি সুদ্ধ উঠে আসে, সেই চাপড়াগুলো শুঁড়ে করে দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাড়ে, তার মাটিগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়, তার পরে মুখের মধ্যে পূরে দিয়ে খেয়ে ফেলে। আবার এক-এক সময় খেয়াল যায়, খানিকটা ধুলো শুঁড়ে করে নিয়ে ফুঁ দিয়ে নিজের পেটে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে হুস্ করে ছড়িয়ে দেয়—এই রকম তো হাতীর প্রসাধন ক্রিয়া। বৃহৎ শরীর, বিপুল বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ—এই প্রকাণ্ড জন্তুটাকে দেখ্‌তে আমার বেশ লাগে। এর এই প্রকাণ্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জন্যই যেন এর প্রতি একটা কী বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়—এর সর্ব্বাঙ্গের অসৌষ্ঠব থেকে এ-কে একটা মস্ত শিশুর মতো মনে হয়। তা ছাড়া জন্তুটা বড়ো উদার প্রকৃতির—শিব ভোলানাথের মতো—যখন ক্ষ্যাপে তখন খুব ক্ষ্যাপে, যখন ঠাণ্ডা হয়—তখন অগাধ শান্তি। বড়োত্বর সঙ্গে সঙ্গে যে এক রকম শ্রীহীনত্ব আছে—তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরঞ্চ আকর্ষণ করে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়—ঐ উস্কো খুস্কো মাথাটার ভিতরে কত বড়ো একটা শব্দহীন শব্দজগৎ! এবং কী একটা বেদনাময় অশান্ত ক্লিষ্ট প্রতিভা, রুদ্ধঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতর ঘূর্ণ্যমান হত।

শুক-তারা

পতিসর, ২৫শে মার্চ্চ ১৮৯৪। আজকাল ভোরের বেলায় চোখ মেলেই ঠিক আমার খোলা জান্‌লার সাম্‌নেই শুকতারা দেখ্‌তে পাই—তাকে আমার ভারি মিষ্টি লাগে—সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, যেন বহুকালের আমার আপনার লোক। মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধ্যাবেলায় নৌকো করে নদী পার হতুম, এবং

রোজ আকাশে সন্ধ্যা-তারা দেখ্‌তে পেতুম আমার ভারি একটা সান্ত্বনা বোধ হত। ঠিক মনে হত আমার নদীটি যেন আমার ঘর-সংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী—আমি কখন কাছারি থেকে ফিরে আস্‌ব এই জন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে! তার কাছ থেকে এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম! তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌ত, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারি যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতিসন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব স্পষ্টরূপে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্য সহচরী না মনে করে থাক্‌তে পারিনে—সে যেন একটি চির-জাগ্রত কল্যাণ কামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ কর্‌তে থাকে।

মেঘ ও রৌদ্র

শিলাইদা, ২৭শে জুন ১৮৯৪। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখ্‌ব তারা আমার দিনরাত্রের সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সঙ্কীর্ণতা দূর কর্‌বে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আপনার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চল্‌ছে, হেনকালে পূর্ব্বসঞ্চিত বিন্দুবিন্দু বারি-শীকর-বর্ষী

তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আম্‌লাবর্গের সমাগম হল—তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক্ তবু সে মনের মধ্যে আছে। আজ গিরিবালা অনাহূত এসে উপস্থিত হয়েছেন; কাল বড়ো আবশ্যকের সময় তাঁর দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্র-ভাগটুকুও দেখা যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের দরকার নেই। শ্রীমতী গিরিবালার তিরোধান সম্ভাবনা থাকে তো থাক—আজ যখন তাঁর শুভাগমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই।

এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল যে আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমাটি ক্ষুদ্র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছে। আমি সে চিত্র বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। সে যেখানে-সেখানে আমাকে মুঠো করে ধরে টল্‌মলে মাথাটি নিয়ে হাম্ করে খেতে আস্‌ত এবং ক্ষুদে ক্ষুদে আঙুলগুলোর মধ্যে আমার চশমার হারটা জড়িয়ে নিতান্ত নির্বোধ নিশ্চিন্ত গম্ভীরভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকত সেই কথাটা মনে পড়ছে।

ইছামতী

পাবনা পথে, ৯ই জুলাই ১৮৯৫। আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর ভিতর দিয়ে চলেছি। এই ছোটো খাম্‌খেয়ালী বর্ষাকালের নদীটি, এই যে দুইধারে সবুজ ঢালু ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত, আর সারি সারি গ্রাম—এ যেন একই কবিতার কয়েকটা লাইন, আমি বার বার আবৃত্তি করে যাচ্ছি এবং বারবারই ভালো লাগছে। পদ্মার মতো বড়ো নদী এতই বড়ো যে সে যেন ঠিক মুখস্থ

করে নেওয়া যায় না—আর এই কেবল কটি বর্ষামাসের দ্বারা অক্ষর-গোণা ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে।

পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁসা নদী ;—তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্ম্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধর্‌বার এবং মেয়েদের স্নান কর্‌বার নদী। স্নানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গল্প গুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীটির হাস্যময় কলধ্বনির সঙ্গে এক সুরে মিলে যায়। আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের পার্ব্বতী যেমন কৈলাস-শিখর ছেড়ে এক-বার তাঁর বাপের বাড়ি দেখে শুনে যান, ইছামতী তেম্‌নি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েকমাস আনন্দ-হাস্য কর্‌তে কর্‌তে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে। তারপরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নূতন খবর শুনে নিয়ে, তাদের সঙ্গে মাথামাখি সখিত্ব করে আবার চলে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘে অন্ধকার; গুরু গুরু মেঘ ডাক্‌ছে, এবং ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের বন-ঝাউগুলো দুলে উঠছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালির মতো অন্ধকার এবং জলের উপর গোধূলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখ্‌তে হয়েছে।

সন্ধ্যা

নাগর নদীর ঘাট, ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৫। কাল অনেক দিন পরে সূর্য্যাস্তের পর ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখ্‌লুম, আকাশের আদি-অন্ত নেই—জন-হীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা হা কর্‌ছে—কোথায় দুটি ক্ষুদ্র-গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সঙ্কীর্ণ একটি জলের রেখা! কেবল নীল

আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহ-হীন অসীম সন্ধ্যা,—মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোম্‌টা টেনে একলা চলেছে ; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্ব্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে, মৌন মুখে, শ্রান্ত পদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে ! কোন্‌ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ ?

দার্জ্জিলিঙ-যাত্রা

দার্জ্জিলিঙ, ১৮৮৭। এই তো দার্জ্জিলিঙ্‌ এসে পড়লুম। পথে বেশী বড়ো একটা কাঁদেনি। খুব চেঁচামেচি গোলমালও করেছে, উলুও দিয়েছে, হাতও ঘুরিয়েছে এবং পাখীকে ডেকেছে, যদিও পাখী কোথায় দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। সারাঘাটে ষ্টীমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গামা। রাত্রি দশটা—জিনিষপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটি মাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল—তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা ছটি মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিষপত্র Ladies compartmentএ তোলা গেল—কথাটা শুন্‌তে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয়নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি—তবু ন—বলেন আমি কিছুই করিনি—অর্থাৎ একখানা আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম খেপ্‌লে যে-রকমটা হয় সেই প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হত। কিন্তু এই দুদিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো

ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্যে এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্র-সন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে; বাক্স দেখ্‌লে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চারিদিকে চেয়ে দেখি বাক্স, কেবলি বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্কা এবং ভারি, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্ম্মের এবং কাপড়ের— নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা—তখন আমার ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায় এবং তখন আমার শূন্য দৃষ্টি, শুষ্ক মুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জ্জিলিঙ পর্য্যন্ত ক্রমাগত স—র উচ্ছ্বাস উক্তি। "ও মা" "কী চমৎকার" "কী আশ্চর্য্য" "কী সুন্দর"—কেবলি আমাকে ঠেলে আর বলে "দেখো দেখো"। কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয়—কখনো বা গাছ, কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুর্জ্জয় খাঁদা নাকওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে—কখনো বা এমন কত কী, যা দেখতে না দেখ্‌তেই গাড়ি চলে যাচ্ছে, এবং স—দুঃখ করছে যে, র—দেখ্‌তে পেলে না। গাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে ঠাণ্ডা, তারপরে মেঘ, তারপরে সর্দ্দি, তারপরে হাঁচি, তারপরে শাল, কম্বল, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্‌কন্‌, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার এবং ঠিক তার পরেই দার্‌জিলিঙ। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি, মোটের উপর মোট্‌, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিষ পত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রসিদ দেখানো, সাহেবের তর্ক বিতর্ক, জিনিষ খুঁজে না পাওয়া এবং সেই হারানো জিনিষ পুনরুদ্ধারের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করা, তারপর বাড়ি যাওয়া।

জীবন-স্মৃতি

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যে-ই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা-কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয় কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না? বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক দিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম জীবন-বৃত্তান্তের দুই চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্ব-হস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের; সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—সুতরাং পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্য্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভব-গম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের

স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

এই স্মৃতি-চিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।

শিক্ষারম্ভ

আমরা তিনটি বালক এক সঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গী দুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে সুরু হইল কিন্তু সে কথা আমার মনেও নাই।

কেবল মনে পড়ে, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" তখন "কর, খল" প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবে মাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" আমার জীবনে এইটেই আদি-কবির প্রথম কবিতা। সে-দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সে-দিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

এই শিশুকালের আর একটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে। আমাদের একটি অনেক কালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুয্যে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আত্মীয়ের মতো। লোকটি ভারি রসিক। সকলের সঙ্গেই তাহার হাসি তামাসা।

সেই কৈলাস মুখুয্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুত-বেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবন-মোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল; ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদ মস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলঙ্কারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের অভূতপূর্ব্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত তাহাতে অনেক প্রবীণ-বয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত—কিন্তু বালকের মন-যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সাম্‌নে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য্য সুখ-চ্ছবি দেখিতে পাইত তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দ-চ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্য-রস-সম্ভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে—আর মনে পড়ে, "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান"। ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।

এমনি করিয়া নিতান্ত শিশু-বয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে-সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্য চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্য-শ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে; দিদিমা—আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ি—যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্ব্বেল কাগজ মণ্ডিত কোণ-ছেঁড়া-মলাট-ওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে

অপরাহ্ণের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

ঘর ও বাহির

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। আহারে আমাদের সৌখীনতার গন্ধও ছিল না। কাপড় চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্ব্বে কোনো দিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ ভোগ করিতাম,—কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বহুল পরিমাণে হইত-যে পাদুকা-সৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

বাহিরবাড়িতে দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। আমাদের এক চাকর ছিল তাহার নাম শ্যাম।

শ্যাম-বর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড় একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্ব্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এই জন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জান্‌লার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব্ব-ধারের প্রাচীরের গায়ে একটা প্রকাণ্ড চীনা বট—দক্ষিণ-ধারে নারিকেল শ্রেণী। গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন্ আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকেরই স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুত-বেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহ বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ এক সময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্ম-সমর্পণ করিত; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো বা ব্যস্ততা লেশ-মাত্র নাই, ধীরে-সুস্থে স্নান করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই

তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এম্‌নি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারা-বেলা ডুব দিয়া গুগ্‌লি তুলিয়া খায়, এবং চঞ্চু চালনা করিয়া ব্যতিব্যস্ত-ভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জ্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্ন-যুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে-যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়া-কলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট ?

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটু বড় হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে নূতন বধূ-সমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গী-রূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন এক-এক দিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে ; গৃহ-কর্ম্মে ছেদ পড়িয়াছে ; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন ; স্নান-সিক্ত শাড়িগুলি ছাতের কার্ণিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে ; উঠানের কোণে যে-উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়া আছে তাহারই

উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেল শ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত সিঙ্গির-বাগান-পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে, যে তারা-গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়াল-ঘর; আরো দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চ-নীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সকল অতি দূর-বাড়ির ছাদে চিলে-কোঠা উঁচু হইয়া থাকিত, মনে হইত তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমারই কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজ-ভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্দুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্ন-মানিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই-করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খর-দীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির-বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া "চাই, চুড়ি চাই, খেলনা চাই" হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পেনেটির বাগান

একবার কলিকাতায় ডেঙ্গু জ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতু বাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটা-কয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারা বনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবা-মাত্র আমার কেমন মনে হইত যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে! পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার-ভাঁটার আসা-যাওয়া, কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গী, সেই পেয়ারা-গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণ-বক্ষ সূর্যাস্ত-কালের অজস্র স্বর্ণশোণিত-প্লাবন। এক-এক দিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ও-পারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ও-পারের তট-রেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে, নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, এবং ভিজা হাওয়া এ-পারের ডাল-পালাগুলার মধ্যে যা-খুসি তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকাল বেলায় এখো-গুড় দিয়া যে বাসি লুচি খাইতাম, নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে-অমৃত খাইয়া থাকেন তাহার সঙ্গে তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই রস-বোধের মধ্যেই আছে—এইজন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পাইই না।

যেখানে আমরা বসিতাম তাহার পিছনে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ঘাট-

বাঁধানো একটা খিড়্‌কির পুকুর—ঘাটের পাশেই একটা মস্ত জামরুল গাছ; চারিধারেই বড় ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীর আব্রু রচনা করিয়া আছে। এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া-করা, সঙ্কুচিত একটু-খানি খিড়্‌কির বাগানের ঘোম্‌টা-পরা সৌন্দর্য্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গঙ্গা-তীরের সঙ্গে এর কতই তফাৎ; এ যেন ঘরের বধূ। কোণের আড়ালে, নিজের হাতের লতা-পাতা-আঁকা সবুজ রঙের কাঁথাটি মেলিয়া দিয়া মধ্যাহ্নের নিভৃত আকাশে মনের কথাটিকে মৃদু-গুঞ্জনে ব্যক্ত করিতেছে। সেই মধ্যাহ্নেই অনেকদিন জামরুল গাছের ছায়ায় ঘাটে একলা বসিয়া পুকুরের গভীর তলাটার মধ্যে যক্ষ-পুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।

বাংলা দেশের পাড়াগাঁটাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘর-বস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তা ঘাট খেলা-ধূলা হাট-মাঠ জীবন-যাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল—কিন্তু সেখানে যাওয়া আমাদের নিষেধ।

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা-ভাড়ায় সওয়ার হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত ভূগোলে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

অন্তঃপুরের ছবি

বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুর ঠিক তেমনিই। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত। রাত্রি নটার পর অঘোর

মাষ্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি—খড়্‌খড়ে দেওয়া লম্বা বারান্দাটাতে মিট্‌মিটে লণ্ঠন জ্বলিতেছে;—সেই বারান্দা পার হইয়া গোটা চার পাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নামিয়া একটি উঠানঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি,—বারান্দার পশ্চিম-ভাগে পূর্ব্ব-আকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে—বারান্দার অপর অংশগুলি অন্ধকার—সেই একটুখানি জ্যোৎস্নায় বাড়ির দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া বসিয়া উরুর উপর প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদুস্বরে আপনাদের দেশের কথা বলাবলি করিতেছে,—এমন কত ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। তার-পরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায় আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম—শঙ্করী কিম্বা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপান্তর মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিত—সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত;—দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম দেয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানাপ্রকারের রেখা-পাত হইয়াছে; সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম,—তারপরে অর্দ্ধরাত্রে কোনো-কোনো দিন আধঘুমে শুনিতে পাইতাম, অতি বৃদ্ধ স্বরূপ-সর্দ্দার উচ্চস্বরে হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আর-এক বারান্দায় চলিয়া যাইতেছে।

শ্রীকণ্ঠবাবু

এই সময়ে একটি শ্রোতা লাভ করিয়াছিলাম—এমন শ্রোতা আর পাইব না। ভালো-লাগিবার শক্তি ইহার এতই অসাধারণ যে মাসিক

পত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচক-পদ লাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই-আমটির মতো—অম্লরসের আভাস-মাত্র-বর্জ্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এত-টুকু আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফদাড়ি-কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখ-বিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারি গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের পারশি পড়া রসিক মানুষ, ইংরেজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্য-সঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্ব্বদাই ফিরিত একটি সেতার এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।

এই বৃদ্ধটি আমার পিতার, তেম্নি দাদাদের, তেম্নি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত। কবিতা শোনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মিলে না। ঝরণার ধারা যেমন এক-টুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাৎ করিয়া দেয়, তিনিও তেম্নি যে-কোনো-একটা উপলক্ষ্য পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন।

গান-সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল—"ময় ছোড়ো ব্রজকি বাসরী"। ঐ গানটা আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতার ঝঙ্কার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক "ময় ছোড়ো" সেই-খানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্ত-ভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালো-লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

ইনি আমার পিতার ভক্ত বন্ধু ছিলেন। ইহারই দেওয়া হিন্দী গান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসঙ্গীত আছে—"অন্তরতম অন্তরতম তিনি যে—ভুলোনারে তাঁয়।" এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝঙ্কার দিয়া একবার বলিতেন "অন্তরতম অন্তরতম তিনি যে," আবার পাল্‌টাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন "অন্তরতম অন্তরতম তুমি যে।"

এই বৃদ্ধ যেদিন আমার পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন পিতৃদেব চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারের বাগানে ছিলেন। শ্রীকণ্ঠ-বাবু তখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত, তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, চোখের পাতা আঙুল দিয়া তুলিয়া চোখ মেলিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার কন্যার শুশ্রূষাধীনে বীরভূমের রায়পুর হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন। বহুকষ্টে একবার-মাত্র পিতৃদেবের পদধূলি লইয়া চুঁচুড়ার বাসায় ফিরিয়া আসেন ও অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যার কাছে শুনিতে পাই আসন্ন মৃত্যুর সময়ে "কী মধুর তব করুণা প্রভো" গানটি গাহিয়া তিনি চিরনীরবতা লাভ করেন।

পিতৃদেব

অমৃতসরে গুরু-দরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেক দিন সকাল-বেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ উপাসকদের মাঝ-খানে বসিয়া সহসা এক-সময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন—বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনা গান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

"তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে
কে সহায় ভব-অন্ধকারে"—

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন,—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠ বাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা—"নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে"। পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হার্মোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান-গাওয়া শেষ হইল। তখন তিনি বলিলেন, দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশো টাকার চেক্ আমার হাতে দিলেন।

* * * * *

অমৃতসরে মাস-খানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্র-মাসের শেষে

ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন পর্ব্বতের উপত্যকা অধিত্যকা-দেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে সৌন্দর্য্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই দুধ-রুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্ণে ডাক-বাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্ত দিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না—পাছে কিছু-একটা এড়াইয়া যায় এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে বাঁকে পল্লব-ভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ-তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই একটি ঝর্‌ণার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঘন শীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্-কুল্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাপান্ নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম এ সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন? এইখানে থাকিলেই তো হয়।

ডাক-বাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্ব্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহ-তারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল। এমন কি, পথের যে-অংশে রৌদ্র পড়িত না সেখানে তখনো বরফ গলে নাই।

কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা আমাকে একদিনও বাধা দেন নাই। আমাদের বাসার নিম্নবর্ত্তী

এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলু-বন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহ-ফলক-বিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ। কিন্তু এই সে-দিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসঙ্কোচে তাহাদের গা ঘেঁসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্র-রাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্ব্বত-চূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষার-দীপ্তি দেখিতে পাইতাম—জানি না কত রাত্রে —দেখিতাম পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোম-বাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

তাহার পর আর-এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্ত-বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের উদ্বোধন।

সূর্য্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।

* * * *

ফাদার ডা-পেনারান্দা

হিমালয় হইতে ফিরিবার পরে সেণ্ট্ জেবিয়ার্সে আমাদের ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল।

সেণ্ট্ জেবিয়ার্সের একটি পবিত্র স্মৃতি আজ পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে অম্লান হইয়া রহিয়াছে—তাহা সেখানকার অধ্যাপকের স্মৃতি। ফাদার ডা-পেনারান্দার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি ছিল না, বোধ করি কিছু দিন তিনি আমাদের নিয়মিত শিক্ষকের বদ্‌লিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংরেজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা ছিল। বোধ করি সেই কারণে তাঁহার ক্লাসের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেষ্ট মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেন কিন্তু নম্রভাবে প্রতিদিন তাহা সহ্য করিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইত। তাঁহার মুখ-শ্রী সুন্দর ছিল না, কিন্তু আমার কাছে তাঁহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত তিনি সর্ব্বদাই আপনার মনের মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন—অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কপি লিখিবার সময় ছিল—আমি তখন কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহা তাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ডা-পেনারান্দা এই ক্লাসের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি দুই তিন বার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন এবং অত্যন্ত সস্নেহ স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাগোর, তোমার কি শরীর ভালো

নাই?”—বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই। অন্য ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম—আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।

* * * *

রচনাপ্রকাশ

এ-পর্য্যন্ত যাহা লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল! এমন সময়ে জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্ত্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ এবং প্রথম যে গদ্য প্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থ-সমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে। তখন ভুবনমোহিনী-প্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোন মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। “সাধারণী” কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

আমি তখন “ভুবনমোহিনী প্রতিভা” “দুঃখসঙ্গিনী” ও “অবসর-সরোজিনী” এই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।

খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা

করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্ব্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় কত। আমার বন্ধু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিলেন একজন বি-এ তোমার এই লেখার জবাব লিখিতেছেন! বি-এ শুনিয়া আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বি-এ! শিশুকালে সত্য যেদিন বারান্দা হইতে পুলিশ-ম্যানকে ডাকিয়াছিল সেদিন আমার যে-দশা, আজও আমার সেইরূপ। আমি চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম খণ্ডকাব্য গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমি যে-কীর্ত্তিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিয়াছি বড়ো বড়ো কোটেশনের নির্ম্মম আঘাতে তাহা সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়াছে এবং পাঠক-সমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ। "কুক্ষণে জনম তোর রে সমালোচনা"! উদ্বেগে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু বি এ সমালোচক বাল্যকালের পুলিশম্যানটির মতোই দেখা দিলেন না।

স্বাদেশিকতা

স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে-একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ প্রেমের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশ-প্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোক দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চির-কাল মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দু-মেলা বলিয়া এক মেলা সৃষ্টি

হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "মিলে সবে ভারত-সন্তান" রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তব-গান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জ্জনের সময় দিল্লী-দরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গভমেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত, চোদ্দ পনের বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এই জন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দু-মেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন-সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো-বয়সে তিনি একদিন একথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপি-চুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত আর বেশি

কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্ব্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি ক্ষ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সঙ্কোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহান। বীরত্ব জিনিষটা কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক্ না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয় তাহার সকল প্রকার রাস্তা মারিয়া তাহার সকল প্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা-যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্য-ব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরাণী-গিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানব-চরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীর-ধর্ম্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানব-ধর্ম্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলি গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে—সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেণ্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসন-মাত্র অভিনয় করিতেছিল তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্ব্বস্মৃতি আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দল বল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে নগণ্য ছিল, অন্ততঃ সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারীর অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুর-মাত্রায় ছিল—আমরা হত আহত পশু পক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বৌঠাকুরাণী রাশিকৃত লুচি তরকারী প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মাণিকতলায় পোড়ো-বাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো-ঘাটে বসিয়া উচ্চ-নীচ নির্বিচারে সকলে একত্রে মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালীকে ডাকিয়া কহিলেন—"ওরে ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন?" মালী তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞে না, বাবু তো আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন, "আচ্ছা ডাব পাড়িয়া আন্।" সে দিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে

গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতি-বর্ণ-নির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্ণে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার-শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণ বাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাত-নাড়া তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড় বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুই ধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির-লুট ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরা কাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারত সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নি-শিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলন-শীলতা বাড়াইতে পারিত তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের বিষয় হইতেছে কিনা তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারো ছিল না—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈয়ার করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে। বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য—তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে। অবশেষে দুটি একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুল দাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখ কষ্ট, 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ,

নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর একদিকে দেশের উন্নতি-সাধন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই কত-রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান্ করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক্ সে তিনি খেয়ালই করিতেন না,—

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্ভক্ত চির-বালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্য-মধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * * *

বিলাত

(১৮ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মেজদাদা ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত প্রথমবার বিলাত গমন করেন।)

লণ্ডনে বাসাটা ছিল রিজেন্ট উদ্যানের সম্মুখেই। তখন ঘোরতর শীত। সম্মুখের বাগানের গাছগুলায় একটিও পাতা নাই—বরফে ঢাকা

আঁকা-বাঁকা রোগা ডালগুলা লইয়া তাহারা সারি সারি আকাশের দিকে তাকাইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে—দেখিয়া আমার হাড়গুলার মধ্যে পর্যন্ত যেন শীত করিতে থাকিত। নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শীতের লণ্ডনের মতো এমন নির্মম স্থান আর কোথাও নাই। কাছা-কাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভাল করিয়া চিনি না। কখনো কখনো ভারতবর্ষীয় কেহ কেহ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্পই ছিল। কিন্তু যখন বিদায় লইয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া যাইতেন আমার ইচ্ছা করিত কোট ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আবার ঘরে আনিয়া বসাই।

এই বাসায় থাকিবার সময় এক-জন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা—গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়—শীতকালের নগ্ন গাছগুলার মতোই তিনি যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি আপন বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। এক-একদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরিবারের সকল লোকে তাঁহাকে বাতিক-গ্রস্ত বলিয়া জানিত। একটা মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন পৃথিবীতে এক-একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানব-সমাজে একই-ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য অনুসারে এই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্তু হাওয়াটা একই। পরস্পরের দেখাদেখি যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে যেখানে দেখাদেখি নাই সেখানেও অন্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কেবলি তথ্যসংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, তাঁহার মেয়েরা তাঁহার মতের প্রতি শ্রদ্ধা মাত্র করে না এবং

সম্ভবত এই পাগলামির জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া থাকে। এক-একদিন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা যাইত—ভালো কোনো একটা প্রমাণ পাইয়াছেন, লেখা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেদিন সেই বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার উৎসাহে আরো উৎসাহ-সঞ্চার করিতাম, আবার এক-একদিন তিনি বড়ো বিমর্ষ হইয়া আসিতেন—যেন যে-ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আর বহন করিতে পারিতেছেন না। সেদিন পড়ানোর পদে পদে বাধা ঘটিত, চোখ দুটো কোন্ শূন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিত, মনটাকে কোনোমতেই প্রথম-পাঠ্য লাটিন ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভারে ও লেখার দায়ে অবনত অনশন ক্লিষ্ট লোকটিকে দেখিলে আমার বড়োই বেদনা বোধ হইত। যদিও বেশ বুঝিতেছিলাম ইঁহার দ্বারা আমার পড়ার সাহায্য প্রায় কিছুই হইবে না—তবুও কোনো-মতেই ইঁহাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে-কয়দিন সে-বাসায় ছিলাম এমনি করিয়া লাটিন পড়িবার ছল করিয়াই কাটিল। বিদায় লইবার সময় যখন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি করুণ স্বরে আমাকে কহিলেন—আমি কেবল তোমার সময় নষ্ট করিয়াছি, আমি তো কোনো কাজই করি নাই, আমি তোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারিব না। আমি তাঁহাকে অনেক কষ্টে বেতন লইতে রাজি করিয়াছিলাম। আমার সেই লাটিন-শিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রমাণ-সহ উপস্থিত করেন নাই তবু তাঁহার সে-কথা আমি এ পর্যন্ত অবিশ্বাস করি না। এখনো আমার এই বিশ্বাস যে সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে; তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

* * * *

স্কট-পরিবার

এবারে ডাক্তার স্কট্ নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল। একদিন সন্ধ্যার সময় বাক্স-তোরঙ্গ লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পক্বকেশ ডাক্তার, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের বড়ো মেয়েটি আছেন। ছোটো দুই জন মেয়ে ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন-আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন আমার দ্বারা কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই তখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া গেলাম। মিসেস্ স্কট্ আমাকে আপনার ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করিয়াছি— মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে আমাদের দেশে পতি-ভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস্ স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরে চাকর-বাকরদের উপসর্গ নাই, প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়, এইজন্য স্বামীর প্রত্যেক ছোটো-খাটো কাজটিও মিসেস্ স্কট নিজের হাতে করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্বামী কাজ করিয়া ঘরে ফিরিবেন, তাহার পূর্ব্বে আগুনের ধারে তিনি স্বামীর আরাম-কেদারা ও তাঁহার পশমের জুতা-জোড়াটি স্বহস্তে গুছাইয়া রাখিতেন। ডাক্তার স্কটের

কী ভালো লাগে আর না লাগে, কোন্ ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয় সে-কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না। প্রাতঃকালে একজন-মাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে নীচের রান্নাঘর, সিঁড়ি এবং দরজার গায়ের পিতলের কাজগুলিকে পর্য্যন্ত ধুইয়া মাজিয়া তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়া দিতেন। ইহার পরে লোক-লৌকিকতার নানা কর্ত্তব্য তো আছেই। গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়া-শুনা গান-বাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদ প্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ।

কয়েক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজ-দাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে। সে-প্রস্তাবে আমি খুসি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক, দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল। বিদায়-গ্রহণ-কালে মিসেস্ স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্প-দিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে?—লণ্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই—এই ডাক্তার-পরিবারের কেহ-বা পরলোকে, কেহ বা ইহলোকে; কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার কোনো সংবাদই জানি না, কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চির-প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

[ইহার অল্পদিন পরেই কবি দেশে ফিরিয়া আসিলেন]

সন্ধ্যাসঙ্গীত

এক সময়ে জ্যোতি-দাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতলার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জ্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন জানি না কেমন করিয়া, কাব্য-রচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই। এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন একটা খালের মতো সিধা চলে না—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশ-মাত্র সঙ্কোচ-বোধ হইল না।

আমার কাব্য-লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসঙ্গীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুসি-তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুসিটার মূল্য আছে।

গান ও কবিতা

গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া,—সেখানে সে গানেরই বাহন-মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্য্যে বড়ো—বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে? বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্ব্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। গুন্ গুন্ করিতে করিতে যখনি একটা লাইন লিখিলাম—"তোমার গোপন কথাটি সখি রেখো না মনে"—তখনি

দেখিলাম স্বর সে-জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল, কথাটা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল আমি যে-গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমা রাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে—তাহা যেন সমস্ত জল-স্থল-আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা। বহু বাল্য-কালে একটা গান শুনিয়াছিলাম "তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে!" সেই গানের ঐ একটি মাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজও ঐ লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বর-গুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম—"আমি চিনিগো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী"—সঙ্গে যদি স্বরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ স্বরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্ত্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোনো বিদেশিনী আনাগোনা করে—কোন্ রহস্য-সিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদ প্রাতে, মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের, বিশ্ব-বিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের স্বর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী!

ইহার অনেক দিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল—

> "খাঁচার মাঝে অচিন্ পাখী কম্‌নে আসে যায়
> ধর্‌তে পার্‌লে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়।"

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন্ পাখী বন্ধন-হীন অচেনার কথা বলিয়া যায়—মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন্ পাখীর নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!

এই কারণে চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সঙ্কোচ বোধ করি। কেননা গানের বহিতে আসল জিনিষই বাদ পড়িয়া যায়। সঙ্গীত বাদ দিয়া সঙ্গীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয় যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মূষিকটাকে ধরিয়া রাখা।

* * * *

গঙ্গাতীর

তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন—আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা। সেই আলস্যে আনন্দে অনির্ব্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনি-করুণ দিন-রাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এখানেই আমার মাতৃ-হস্তের অন্ন-পরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশ-ভরা আলো, দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্ত-প্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত

শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল। সে তো খুব বেশি দিনের কথা নহে—তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তরুচ্ছায়া-প্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নিভৃত নীড়গুলির মধ্যে কল-কারখানা, ঊর্দ্ধফণা সাপের মতো প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন খর-মধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রশস্ত স্নিগ্ধছায়া সঙ্কীর্ণতম হইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্ব্বত্রই অনবসর আপন সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হয়তো সে ভালোই—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্ম ফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘন-ঘোর বর্ষার দিনে হার্ম্মোনিয়ম-যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির "ভরা বাদর মাহ ভাদর" পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত-মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন ক্ষ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো বা সূর্য্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম—পশ্চিম-তটের আকাশে সোনার খেল্‌নার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব্ব-বনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

ঘাটের উপরেই বৈঠকখানা-ঘরের সার্সিগুলিতে রঙীন ছবি-ওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের

শাখায় একটি দোলা—সেই দোলায় রৌদ্রছায়া-খচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে ; আর একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গ-প্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসব-বেশে সজ্জিত নরনারী কেহ বা উঠিতেছে কেহ-বা নামিতেছে। সার্সির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড়ো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দূর-দেশের কোন্ দূর-কালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্‌মল্ করিয়া মেলিয়া দিত এবং কোথাকার কোন্ একটি চির-নিভৃত ছায়ার যুগল দোলনের রসমাধুর্য্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।

প্রভাত সঙ্গীত

এইরূপে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতি-দাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া "বৌঠাকুরাণীর হাট" ও একটি একটি করিয়া "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" লিখিতেছি এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলট-পালট হইয়া গেল।

সদরষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া

আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দ-রূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেহ চলিত তাহাদের গতি-ভঙ্গী, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখ-শ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল-সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আরেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্ব-জগতে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝর্না ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণী-ব্যাপী সমগ্র মানবের দেহ-চাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহা সৌন্দর্য্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা পালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে-একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি—

ইহা কবি-কল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। এ-পর্যন্ত বাংলা দেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে, এমন আর কাহারো নহে।

মাণিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ ছিল সেখানে আমি যখন-তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম—দেখিতাম তিনি লেখা পড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন. সকলেই জানেন তিনি কানে কম শুনিতেন। এই জন্য পারৎপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিয পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে-সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা-কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন।

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার

মতো অর্ব্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া ভারি একটি দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গেও বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন— অথচ তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। যোদ্ধবেশে তাঁহার রুদ্র-মূর্ত্তি বিপদজনক ছিল। ম্যুনিসিপাল সভায় সেনেট-সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্য্যবান্। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। এসিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থ প্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে এই উপলক্ষ্যে তখনকার কালের মহত্ত্ব-বিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাঁহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তি যন্ত্র-মাত্র, ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে আমিই বুঝি কৃতী, আর যন্ত্রীটি বুঝি অনাবশ্যক শোভা-মাত্র। কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোনো একদিন সে মনে করিয়া বসিত—লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালি পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

কারোয়ারে "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক নাট্য-কাব্যটি লিখিয়া-ছিলাম। কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহ-বন্ধন মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে

সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল। ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর মধ্যে একদিকে যত-সব পথের লোক, যত-সব গ্রামের নর-নারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতন-ভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর-একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনো-মতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ-বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম :—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাদেগো নন্দরাণী—
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকেরা মাঠে যাইতেছে,—সেই সূর্য্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না,—সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে,—সেইখানেই অসীমের সাজপরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায় ;—সেইখানেই মাঠে ঘাটে বনে পর্ব্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দূরে নয়, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য—পীত-ধড়া ও বন-ফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট।

ছবি ও গান

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় আমার বয়স ২২ বৎসর। 'ছবি ও গান' নাম ধরিয়া আমার যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

চৌরঙ্গির নিকটবর্ত্তী সার্কুলার রোডের একটি বাগান-বাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভাল লাগিত, সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।

নানা জিনিষকে দেখিবার যে-দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম ; এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা-পরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভালো লাগিত। সে আর-কিছু নয়, এক একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা, -চোখ দিয়া মনের জিনিষকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে

পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ্ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।

নানা মানুষ

তখনকার দিনগুলি নির্ভাবনার দিন ছিল। পথ দিয়া নানা লোক নানা কাজে চলিয়া যাইত, আমি চাহিয়া দেখিতাম—এবং বর্ষা শরৎ বসন্ত দূর প্রবাসের অতিথির মতো অনাহূত আমার ঘরে আসিয়া কাটাইয়া দিত।—কিন্তু শুধু কেবল শরৎ বসন্ত লইয়াই আমার কারবার ছিল না। আমার ছোট ঘরটাতে কত অদ্ভুত মানুষ মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার সীমা নাই; তাহারা যেন নোঙর-ছেঁড়া নৌকা—কোনো প্রয়োজন নাই কেবলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উহারই মধ্যে দুই একজন লক্ষীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার দ্বারা অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিতে কোনো কৌশলেরই প্রয়োজন ছিল না—তখন আমার সংসার-ভার লঘু ছিল এবং বঞ্চনাকে বঞ্চনা বলিয়াই চিনিতাম না। আমি অনেক ছাত্রকে দীর্ঘকাল পড়িবার বেতন দিয়াছি যাহাদের পক্ষে বেতন নিষ্প্রয়োজন এবং পড়াটার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই অনধ্যায়। একবার এক লম্বা চুল-ওয়ালা ছেলে তাহার কাল্পনিক ভগিনীর এক চিঠি আনিয়া আমার কাছে দিল। তাহাতে তিনি তাঁহারই মতো কাল্পনিক এক বিমাতার অত্যাচারে পীড়িত এই সহোদরটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেবল এই সহোদরটিই কাল্পনিক নহে তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম।

কিন্তু যে-পাখী উড়িতে শেখে নাই তাহার প্রতি অত্যন্ত তাকবাগ করিয়া বন্দুক লক্ষ্য করা যেমন অনাবশ্যক—ভগিনীর চিঠিও আমার পক্ষে তেমনি বাহুল্য ছিল। একবার একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল সে বি-এ পড়িতেছে, কিন্তু মাথার ব্যামোতে পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। শুনিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই ন্যায় ডাক্তারি বিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না, সুতরাং কী উপায়ে তাহাকে আশ্বস্ত করিব ভাবিয়া পাইলাম না। সে বলিল, স্বপ্নে দেখিয়াছি পূর্ব্বজন্মে আপনার স্ত্রী আমার মাতা ছিলেন, তাঁহার পাদোদক খাইলেই আমার আরোগ্যলাভ হইবে। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, আপনি বোধ হয় এ সমস্ত বিশ্বাস করেন না। আমি বলিলাম, আমি বিশ্বাস নাই করিলাম, তোমার রোগ যদি সারে তো সারুক। স্ত্রীর পাদোদক বলিয়া একটা জল চালাইয়া দিলাম। খাইয়া সে আশ্চর্য্য উপকার বোধ করিল। ক্রমে অভিব্যক্তির পর্য্যায়ে জল হইতে অতি সহজে সে অন্নে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে আমার ঘরের একটা অংশ অধিকার করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকাইয়া সে তামাক খাওয়াইতে লাগিল। আমি সসঙ্কোচে সেই ধূমাচ্ছন্ন ঘর ছাড়িয়া দিলাম। ক্রমে অত্যন্ত স্থূল কয়েকটি ঘটনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতে লাগিল, তাহার অন্য যে-ব্যাধি থাক্ মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ছিল না। ইহার পরে পূর্ব্ব-জন্মের সন্তানদিগকে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। দেখিলাম এ-সম্বন্ধে আমার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন চিঠি পাইলাম আমার গত-জন্মের একটি কন্যা-সন্তান রোগশান্তির জন্য আমার প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল, পুত্রটিকে লইয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছি কিন্তু গত-জন্মের কন্যাদায় কোনোমতেই আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম না।

বঙ্কিমচন্দ্র

এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

সেই সম্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবল-মাত্র তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড়ো বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব ছিল তাহা নহে তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজ-তিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোটো ঘটনা ঘটিল তাহার ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ

সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে, অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিত-মহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিম-বাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

* * * * *

আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি—রমেশদত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিম-বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; —রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিম বাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, "এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য—রমেশ তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ?" তিনি বলিলেন "না"।—তখন বঙ্কিম বাবু সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।

জাহাজের খোল

কাগজে কী-একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতি-দাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পূরা জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশালাই কাঠি

জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশালাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই ; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল কিন্তু সেই তাঁতের কল একটি-মাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে খোল একদা ভর্ত্তি হইয়া উঠিল, শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে, ঋণে এবং সর্ব্বনাশে। কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে এই সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বে-হিসাবী অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন ; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং সে-বন্যা হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে-পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণ-পূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে কিন্তু সমস্ত জীবন যাহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্ত্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

এক দিকে বিলাতী কোম্পানি, আর-এক দিকে তিনি একলা—এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল,—বরিশাল খুলনার ষ্টীমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা-ভাড়ায় যাতায়াত সুরু করিলেন তাহা নহে, তাঁহারা

বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহার উপরে বরিশালের ভলাণ্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্ত্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল। সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকল প্রকার অভাবই বাড়িল বই কমিল না। অঙ্ক-শাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশ-হিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না;—কীর্ত্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নাম্‌তা ভুলিতে পারিল না—সুতরাং তিন-ত্রিক্‌খে-নয় ঠিক তালে তালে ফড়িংয়ের মতো লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না; অথচ তাঁহারা যে চেনেন না—এইটুকু-মাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনা-মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতি-দাদার কর্ম্মচারীরা যে তপস্বীর মতো উপবাস করিতেছিল এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই, অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল কর্ম্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতি-দাদার—সে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব-ক্ষতিস্বীকার।

তখন খুলনা বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়-পরাজয়ের সংবাদ আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল তাঁহার 'স্বদেশী' নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। এইরূপে তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকি রাখিলেন না, তখনি তাঁহার ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেল।

বর্ষা ও শরৎ

এক-এক বৎসরে বিশেষ এক-একটা গ্রহ রাজার পদ ও মন্ত্রীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরম্ভেই পশুপতি ও হৈমবতীর নিভৃত আলাপে তাহার সংবাদ পাই। তেম্‌নি দেখিতেছি জীবনের এক-এক পর্য্যায়ে এক-একটি ঋতু বিশেষভাবে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্য-কালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাতাসের বেগে জলের ছাটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড়ো ঝুড়িতে তরি-তরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জল কাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর মনে পড়ে ইস্কুলে গিয়াছি; দর্‌মায়-ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে;—অপরাহ্নে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে;—দেখিতে দেখিতে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ; আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কোনো পাগ্‌লী ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে; বাতাসের দম্‌কায় দর্‌মার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চায়, অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না—পণ্ডিত মশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বাহিরের ঝড়-বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি মাতামাতির বরাত দিয়া বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি। আরো মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ মনের সুপ্তির চেয়ে নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে-মনে

প্রার্থনা করিতেছি সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।

কিন্তু আমি যে-সময়কার কথা বলিতেছি সে-সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই তখন শরৎ ঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ আকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই শিশিরে ঝল্‌ঝল্‌-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া স্বর লাগাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি—সেই শরতের সকালবেলায়।

"আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়।"

বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘ-রৌদ্রের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই, এদিকে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের "কড়ি ও কোমলে" কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিদায় গ্রহণ

এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখানে কত ভাঙা-গড়া, কত জয়-পরাজয়, কত সংঘাত ও

সম্মিলন! এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবন-দেবতা যে-একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায় তবে আর যাহা কিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানই হইবে। মূর্ত্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাস্-মহালের দরজার কাছে পর্য্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছে হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

য়ুরোপ-যাত্রী

২২ আগষ্ট, ১৮৯১। তখন সূর্য্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। বামে বোম্বাই বন্দরের এক দীর্ঘরেখা এখনো দেখা যাচ্ছে; দেখে মনে হল আমাদের পিতৃপিতামহের পুরাতন জননী সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাকুলবাহু বিক্ষেপ করে ডাক্‌ছেন, বল্‌ছেন আসন্ন রাত্রিকালে অকূল সমুদ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাস্‌নে। এখনো ফিরে আয়।

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় দেহ বিস্তার কর্‌লে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো জ্বলে উঠ্‌ল; সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্য ভূমি-মাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।

তখন আমার হৃদয়ের মধ্যে ঐ গানটা ধ্বনিত হতে লাগ্‌ল "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।"

জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাস্‌লো তরী সন্ধেবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।—

কিন্তু সী-সিক্‌নেসের কথা কে মনে করেছিল!

যখন সবুজ জল ক্রমে নীল হয়ে এল এবং তরঙ্গে তরীতে মিলে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করে দিলে, তখন দেখলুম সমুদ্রের পক্ষে জল-খেলা বটে কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

ভাব্‌লুম এই বেলা মানে-মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়িগে। যথাসম্ভব ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে কাঁধ হতে কম্বলটি একটি বিছানার উপর ফেলে দরজা বন্ধ করে দিলুম। ঘর অন্ধকার। বুঝ্‌লুম, আলো নিবিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় শুয়েছেন। শারীরিক দুঃখ নিবেদন করে একটুখানি স্নেহ উদ্রেক কর্‌বার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা ঘুমিয়েছেন কি?" হঠাৎ নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে-একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল "হূজ দ্যাট!" আমি বল্‌লুম "বাসরে! এ তো দাদা নয়।" তৎক্ষণাৎ বিনীত অনুতপ্তস্বরে জ্ঞাপন কর্‌লুম, "ক্ষমা কর্‌বেন, দৈবক্রমে ভুল কুঠরিতে প্রবেশ করেছি।" অপরিচিত কণ্ঠে বল্লে "অল্ রাইট্।" কম্বলটি পুনশ্চ তুলে নিয়ে কাতর শরীরে সঙ্কুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাইনে। বাক্স তোরঙ্গ লাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিষের মধ্যে খট্ খট্ শব্দে হাত্‌ড়ে বেড়াতে লাগ্‌লুম। ইঁদুর কলে পড়্‌লে তার মানসিক ভাব কী-রকম হয় এই অবসরে কতকটা বুঝ্‌তে পারা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়েছিল।

এদিকে লোকটা কী মনে কর্‌ছে! অন্ধকারে পরের ক্যাবিনে ঢুকে বেরোবার নাম নেই—খট্ খট্ শব্দে দশ মিনিট কাল জিনিষপত্র হাত্‌ড়ে বেড়ানো—এ কি কোনো সদ্বংশীয় সাধুলোকের কাজ! মন যতই ব্যাকুল শরীর ততই গলদ্‌ঘর্ম্ম এবং কণ্ঠাগত অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠ্‌ছে। অনেক অনুসন্ধানের পর যখন হঠাৎ দ্বার উদ্‌ঘাটনের গোলকটি, সেই মসৃণ চিক্কণ শ্বেতকাচ-নির্ম্মিত

দ্বারকর্ণ টি হাতে ঠেক্‌ল তখন মনে হল এমন প্রিয়স্পর্শসুখ বহুকাল অনুভব করা হয় নি। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে নিঃসংশয়চিত্তে তার পরবর্ত্তী ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়ে দেখি আলো জল্‌ছে; কিন্তু মেজের উপর পরিত্যক্ত গাউন পেটিকোট্‌ প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত। আর অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্ব্বেই পলায়ন করলাম। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বার বার তিনবার ভ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তৃতীয়বার পরীক্ষা কর্‌তে আমার আর সাহস হল না, এবং সেরূপ শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে বিহ্বলচিত্তে জাহাজের কাঠরার পরে ঝুকে পড়ে আভ্যন্তরিক উদ্বেগ এক দফা লাঘব করা গেল। তার পরে বহুলাঞ্ছিত অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে কম্বলটি গুটিয়ে তার উপর লজ্জিত নতমস্তক স্থাপন করে একটি কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু কী সর্ব্বনাশ! এ কার কম্বল! এ তো আমার নয় দেখ্‌ছি। যে সুখসুপ্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোকটির ঘরের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ করে দশ মিনিটকাল অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলুম নিশ্চয়ই এ তারই। একবার ভাব্‌লুম ফিরে গিয়ে চুপিচুপি তার কম্বল স্বস্থানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি; কিন্তু যদি তার ঘুম ভেঙে যায়? পুনর্ব্বার যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার আবশ্যক হয় তবে সে কি আর আমাকে বিশ্বাস কর্‌বে? যদি বা করে, তবু এক রাত্রের মধ্যে দুবার ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌লে নিদ্রাকাতর বিদেশীর খৃষ্টীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি?—আরো একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল। দৈববশতঃ দ্বিতীয়বার যে-ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে পড়েছিলুম তৃতীয়বারও যদি ভ্রমক্রমে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রলোকটির কম্বলটি সেখানে রেখে সেখানকার

একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তা হলে কী-রকমের একটা লোম-হর্ষণ প্রমাদ-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়! আর কিছুই নয়, পরদিন প্রাতে আমি কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাব এবং কে আমাকে ক্ষমা করবে? প্রথম ক্যাবিনচারী হতবুদ্ধি ভদ্রলোকটিকেই বা কী বলব এবং দ্বিতীয় ক্যাবিনবাসিনী বজ্রাহতা ভদ্ররমণীকেই বা কী বোঝাবো? ইত্যাকার বহুবিধ দুশ্চিন্তায় তীব্রতাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রাত্রি যাপন করলাম।

* * * *

২৩ আগষ্ট। কিন্তু সী-সিক্‌নেস্ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্যাবিনে চার দিন পড়ে আছি।

২৬ আগষ্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড়ো কম হয়নি—সূর্য্য চারবার উঠেছে এবং তিনবার অস্ত গেছে; বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ-উদ্ধার পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেছে—জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চল্‌ছিল—কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হয়ে পড়েছিলুম। আধুনিক কবিরা কখনো মুহূর্তকে অনন্ত, কখনো অনন্তকে মুহূর্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত ব্যায়াম-বিপাকে প্রবৃত্ত করান। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড়ো রকমের একটা মুহূর্ত বল্‌বো, না এর প্রত্যেক মুহূর্তকে এক যুগ বল্‌বো স্থির করতে পাচ্ছিনে।

* * * *

২৯ আগষ্ট। জ্যোৎস্না রাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থাম্‌ল। আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধু ছাদের এক প্রান্তে চৌকি দুটি সংলগ্ন করে আরামে বসে আছি। নিস্তরঙ্গ

সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্ব্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্য-বিজড়িত অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন-মরীচিকার মতো লাগছে।

সূর্য্য অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমৎকার রং দেখা দিয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখা মাত্র নেই। দিগন্ত-বিস্তৃত অটুট জলরাশি যৌবন-পরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মতো একেবারে নিটোল এবং সুডোল। এই অপার অখণ্ড পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত থম্‌থম্‌ করছে। বৃহৎ সমুদ্র হঠাৎ যেন এমন একটা জায়গায় এসে থেমেছে যার উর্দ্ধে আর গতি নেই, পরিবর্ত্তন নেই; যা অনন্তকাল অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্ব্বাণ। সূর্য্যাস্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে-একটি সর্ব্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতলরেখায় বিস্তৃত করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলের যে চমৎকার বর্ণ-বিকাশ হয়েছে সে আকাশের ছায়া কি সমুদ্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্ত্তি পেয়ে তাকে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করে তুলেছে।

* * * *

৩১ আগষ্ট। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে উপরের ডেকে চৌকিতে বসে সমুদ্রের বায়ু সেবন করছি, এমন সময় নীচের ডেকে খৃষ্টানদের উপাসনা আরম্ভ হল। যদিও জানি এদের মধ্যে অনেকেই শুষ্কভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়ে কল-টেপা আর্গিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু তবু এই যে দৃশ্য—এই যে গুটিকতক চঞ্চল ছোটো ছোটো

মনুষ্য অপার সমুদ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কণ্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের ভক্তি উপহার প্রেরণ করছে, এ অতি আশ্চর্য।

* * * * *

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছনো গেল। মালগাড়ি প্রস্তুত ছিল আমরা গাড়িতে উঠ্‌লুম্। গাড়ি যখন ছাড়্‌লো তখন টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আহার করে এসে একটি কোণে জান্‌লার কাছে বসা গেল।

দুইধারে কেবল আঙুরের ক্ষেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও কাটল বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত বেঁটেখাটো রকমের; পাতাগুলো উর্দ্ধমুখ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায়, এই গাছগুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত দরিদ্র লক্ষীছাড়া, বহু কষ্ট বহু চেষ্টায় কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক-একটা এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়ছে যে পাথর উঁচু করে তাদের ঠেকো দিয়ে রাখ্‌তে হয়েছে।

বামে চষা মাঠ; শাদা শাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুক্‌রো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক একটি ছোটো ছোটো সহর দেখা দিচ্ছে। চূড়া-মুকুটিত শাদা ধব্‌ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মতো কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাসছে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত, ফলের ক্ষেত, জলপাইয়ের বন; ক্ষেতগুলি খণ্ড প্রস্তরের বেড়া দেওয়া। মাঝে মাঝে এক একটি বাঁধা কূপ। দূরে দূরে দুটো একটা সঙ্গীহীন ছোটো শাদা বাড়ি।

সূর্য্যাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে বসে এক আধটা করে মুখে দিচ্ছি। এমন মিষ্ট

টস্‌টসে সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্ব্বে কখনো খাইনি। মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা ঐ ইতালীয়ান যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, ইতালীয়ানীরা এখানকার আঙুরের গুচ্ছের মতো অম্‌নি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য্য, যৌবনরসে অম্‌নি উৎপূর্ণ—এবং ঐ আঙুরেরই মতো তাদের মুখের রং—অতি বেশি শাদা নয়।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড্রিয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আসছিলুম, আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চল্‌ছে। চারি-দিকে আঙুর, জলপাই, ভূট্টা ও তুঁতের ক্ষেত। কাল যে আঙুরের লতা দেখা গিয়েছিল সেগুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মতো। আজ দেখ্‌ছি, ক্ষেতময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারি উপর ফলগুচ্ছপূর্ণ দ্রাক্ষালতা লঁতিয়ে উঠেছে। রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটীর; এক হাতে তারি একটি দুয়ার ধরে এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালীয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করছে। অনতিদূরে একটি ছোটো বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গোরুর গলার দড়িটি ধরে নিশ্চিন্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

দক্ষিণে বামে তুষার-রেখাঙ্কিত সুনীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা দিয়েছে। বামে ঘনচ্ছায়া স্নিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্ছে সেইখানেই শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্ব্বত সমেত এক একটা নব নব আশ্চর্য্য দৃশ্য খুলে যাচ্ছে। পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গশিখর, তলদেশে এক একটি ছোটো ছোটো গ্রাম।

* * * * *

এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফরাসী জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী। তার পূর্ব্ব-তীরে "ফার্" অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকে চুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে পাথরগুলোকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে

ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড়বার চেষ্টা করছে। বরাবর পূর্ব্ব-তীর দিয়ে একটি পার্ব্বত্য পথ সমরেখায় স্রোতের সঙ্গে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সঙ্কীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্ব্বসঙ্গিনী মুহূর্ত্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বামে একবার অন্তরালে। বিচিত্র কৌতুকচাতুরী। আবার হয় তো যেতে যেতে কোন্ এক পর্ব্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচম্‌কা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে গেছে। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্লার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাক শব্‌জি। মনে হয় কেবলি বাগানের পর বাগান আস্‌ছে। এই কঠিন পর্ব্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে। এদেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাস্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান প্রদান চল্‌ছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে আর একদিকে বৈরাগ্য-বৃদ্ধ মানব উদাসীন ভাবে শুয়ে—য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে।

এ কী চমৎকার চিত্র! পর্ব্বতের কোলে, নদীর ধারে হ্রদের তীরে পপ্লার-উইলোবেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফল--

শস্তপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালোবাস্‌ছে। মানুষের মতো জীবের এই তো যোগ্য আবাস-স্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দ্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জ্বল করে না তুল্‌তে পারে তবে তরুকোটর গুহাগহ্বর-বনবাসী জন্তুর সঙ্গে তার প্রভেদ কী?

* * * *

১১ সেপ্টেম্বর। লণ্ডনে পৌঁছে সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল।

প্রথমে, লণ্ডনের মধ্যে আমার একটি পূর্ব্বপরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে-দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনিনে। তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বল্‌লে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম কোথায় থাকেন? সে বল্‌লে, আমি জানিনে, আপনারা ঘরে এসে বসুন আমি জিজ্ঞাসা করে আস্‌ছি। পূর্ব্বে যে ঘরে আমরা আহার কর্‌তুম সেই ঘরে গিয়ে দেখ্‌লুম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবি-লের উপর খবরের কাগজ এবং বই—সে-ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষা-শালা হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে দাসী একটি কার্ডে-লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোন্ এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। নিরাশ হৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলাম।

মনে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। আমাদের সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দ্বারীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—সেই অমুক এখানে আছে তো? দ্বারী উত্তর কর্‌ল—না, সে অনেক দিন হল চলে গেছে।—চলে গেছে? সেও চলে গেছে! আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-সুদ্ধ আর সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই

আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেছে। তবে তো সেই সমস্ত জানা লোকেরা আর কেউ কারো ঠিকানা খুঁজে পাবে না। জগতের কোথাও তাদের আর নির্দ্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি এমন সময়ে বাড়ির কর্ত্তা বেরিয়ে এলেন—জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, তুমি কে হে। আমি নমস্কার করে বল্‌লুম, আজ্ঞে আমি কেউ না, আমি বিদেশী।—কেমন করে প্রমাণ কর্‌বো এ বাড়ি আমার এবং আমাদের ছিল? একবার ইচ্ছে হল অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি; আমার সেই গাছগুলো কত বড়ো হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই ঘর এবং সেই আর-একটা ঘর। আর সেই-যে ঘরের সম্মুখে বারাণ্ডার উপর ভাঙা টবে গোটাকতক জীর্ণ গাছ ছিল—সেগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে হয়তো ঠিক তেম্‌নি রয়ে গেছে, তাহাদের সরিয়ে ফেল্‌তে কারো মনে পড়েনি।

আর বেশিক্ষণ কল্পনা কর্‌বার সময় পেলাম না। লণ্ডনের সুরঙ্গ-পথে যে পাতাল-বাষ্পযান চলে, তাই অবলম্বন করে বাসায় ফের্‌বার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পরিণামে দেখ্‌তে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সফল হয় না। আমরা দুই ভাই তো গাড়িতে চড়ে বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছি; এমন সময় গাড়ি যখন হ্যামার্‌স্মিথ নামক দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়ে থাম্‌ল তখন আমাদের বিশ্বস্ত চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, আমাদের গম্যস্থান যেদিকে এ-গাড়ির গম্যস্থান সেদিকে নয়। পুনর্ব্বার তিন চার ষ্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য ষ্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাই নে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা টিফিন খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে আমরা দুটি ভাই

লিভিংষ্টোন অথবা ষ্ট্যান্‌লির মতো ভৌগোলিক আবিষ্কারক নই; পৃথিবীতে যদি অক্ষয় খ্যাতি উপার্জ্জন কর্‌তে চাই তো নিশ্চয়ই অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ কর্‌তে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে তিনি যতই কল্পনার চর্চ্চা করুন না কেন, কখনো পথ ভোলেন না। সুতরাং তাঁকেই আমাদের লণ্ডনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়িনে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে এ-রকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ সংসারে কুসুমে কণ্টক কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু ভাগ্যিস্ আছে!

৫ অক্টোবর। কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠ্‌ছিনে। বল্‌তে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভালো লাগ্‌ছে না। সেটা গর্ব্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়—সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ৎ সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের যে-ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য পড়ে। অতএব সেটা হচ্ছে 'আইডিয়াল' য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না কর্‌লে সেটা প্রত্যক্ষ কর্‌বার জো নেই। তিন মাস, ছমাস কিম্বা ছবছর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত পা নাড়া দেখ্‌তে পাই মাত্র। বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চল্‌ছে ফির্‌ছে, যাচ্ছে আস্‌ছে, খুব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র যতই আশ্চর্য্য হোক্ না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়; কেবলমাত্র বিস্ময়ের আনন্দ চিত্তকে পরিপূর্ণ কর্‌তে পারে না বরং তাতে মনকে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত কর্‌তে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে—আচ্ছা ভালরে বাপু, আমি মেনে নিচ্ছি তুমি মস্ত সহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের সীমা

নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি ; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম তাহলে এখানকে আর প্রবাস বলে মনে হত না।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।—

৭ অক্টোবর। "টেম্‌স্" জাহাজে একটা কেবিন স্থির করে আসা গেল। পর্শু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলাতে রয়ে গেলেন।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য্য উঠেছে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডান দিক থেকে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট্ দ্বীপের পার্ব্বত্য তীর এবং ভেণ্ট্‌নর সহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়্‌ল।

* * * *

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠ্‌রা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্ গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখ্‌তে পেলুম অনেক দিন ইংরাজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত এবং অতৃপ্ত হয়েছিল। হঠাৎ এই বাংলা সুরটা পিপাসার জলের মতো বোধ হল। সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যে-রকম প্রসারিত হল, এমন আর কোনো সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে-

যে, ইংরাজি সঙ্গীত লোকালয়ের সঙ্গীত ; আর আমাদের সঙ্গীত প্রকাণ্ড নির্জ্জন প্রকৃতির অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় বিষাদের সঙ্গীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে-গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নয়, সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্ত্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

২৩ অক্টোবর। সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ অতি মন্থর গতিতে চলেছে।

উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্ত্তী পৃথিবীর অপরিচিত নিভৃত নদীকলধ্বনিত ছায়াসুপ্ত বাংলাদেশ, আমার সেই অকর্ম্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনা-ক্লিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি এই সূর্য্যকিরণে, তপ্ত বায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মতো আমার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠ্‌ছে।

ডেকের উপরে গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম দুধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর—জলের ধারে-ধারে একটু একটু বন-ঝাউ এবং অর্দ্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডানদিকের বালুকা-রাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। প্রখর সূর্য্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং সাদা পাগ্‌ড়ি দেখা যাচ্ছে। কেউ-বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে, কেউ-বা নমাজ পড়্‌ছে, কেউ-বা নাসারজ্জু ধরে অনিচ্ছুক উটকে টানাটানি কর্‌ছে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব-মরুভূমির একখণ্ড ছবির মতো মনে হল।

৩ নবেম্বর। অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাইবন্দরে পৌঁছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে নেমে এখন সংসারটা

মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্ছে। কেবল একটা গোল বেধেছিল—টাকাকড়িসমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিলুম। তাতে করে সংসারের আকৃতির হঠাৎ অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে এনেছি। এই ব্যাগ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মতো একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনি সাবধান করে দিলুম ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বল্‌লে, 'ক্ষেপেছ! আমাকে তেম্‌নি লোক পেয়েছ,—আজ সকালে তাকে বিলক্ষণ এক-চোট ভর্ৎসনা করেছি—সে নতমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল। তার পর যখন ব্যাগ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত করে পরিহাস করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতাভিমুখী গাড়িতে চড়ে বসা গেল তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু আমার সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

ভাদ্র—কার্ত্তিক, ১২৯৮।

জাপান-যাত্রী

যাত্রারম্ভ

তোসামারু জাহাজ। ১৯ বৈশাখ, ১৩২৩। বোম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চল্‌তে দেরি করে নি। কল্‌কাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাক্‌তে হয়। এটা ভালো লাগে না। কেননা যাত্রা করার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চল্‌বার মুখে, তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা তার এক শক্তির সঙ্গে তার আর এক শক্তির লড়াই বাধানো।

বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চল্‌ল না অর্থাৎ যারা থাক্‌বার তারাই গেল, আর যেটা চল্‌বার সেটাই স্থির হয়ে রইল,—বাড়ি গেল সরে, আর তরী রইলো দাঁড়িয়ে।

রাত্রে বাইরে শোওয়া গেল, কিন্তু এ কেমনতরো বাইরে? জাহাজের মাস্তলে মাস্তলে আকাশটা যেন ভীষ্মের মতো শর-শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা কর্‌ছে। কোথাও শূন্য-রাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তু-রাজ্যের স্পষ্টতাও নেই।

কোনো-একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে, আমি নিশীথ-রাত্রির সভা-কবি। আমার বরাবর এ কথাই মনে হয়-যে দিনের বেলাটা মর্ত্ত্য-লোকের, আর রাত্রি-বেলাটা সুর-লোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছের পথটা স্পষ্ট করে দেখতে চায়, এই জন্যে এত বড়ো একটা আলো জ্বাল্‌তে হয়েছে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এই জন্যেই অসীম অন্ধকার

দেব-সভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্ম্মল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মতো,—তা অঞ্জনের মতো কালো, কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মতো,—তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল। রাত্রির সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদিরপুরের জেটির উপর মলিন দেখ্‌লুম। মনে হল দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন করে রয়েছেন।

সমুদ্রে ঝড়

২১ বৈশাখ। বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহনায় পাইলট্ নেবে গেল। এর কিছু আগে থাক্‌তেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েছে। তার কূলের বেড়ি খসে গেছে। কিন্তু এখনও তার মাটির রঙ ঘোচেনি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে কথা এখনো প্রকাশ হয় নি,—কেবল দেখা গেল জলে আকাশে এক-দিগন্তের মালা বদল করেছে। যে ঢেউ দিয়েছে, নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মতো তার ছোটো ছোটো পদ-বিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা—কিন্তু এখনো সমুদ্রের শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত সুরু হয় নি।

পাইলটের হাতে আমাদের ডাঙার চিঠি-পত্র সমর্পণ করে দিয়ে প্রসন্নমনে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বস্‌লুম।

হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানী দারোয়ানদের খচ্‌মচির মতো বাতাসের লয়টা ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠ্‌ল। জলের উপর সূর্য্যাস্তের আল্‌পনা-আঁকা আসনটি আচ্ছন্ন করে নীলাম্বরীর ঘোম্‌টা-পরা সন্ধ্যা এসে বস্‌ল। আকাশে তখনও মেঘ নেই, আকাশ-সমুদ্রের ফেনার মতোই ছায়াপথ জল্‌জল্ করতে লাগ্‌ল।

ডেকের উপর বিছানা করে যখন শুলুম, তখন বাতাসে এবং জলে বেশ একটা কবির লড়াই চলেছে,—একদিকে সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েছে, আর-একদিকে ছল্ ছল্ শব্দে জবাব দিচ্ছে, কিন্তু ঝড়ের পালা বলে মনে হল না। আকাশের তারাদের সঙ্গে চোখাচোখি করে কখন এক সময় চোখ বুজে এল।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম্ আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে সেইটে কাকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। আশ্চর্য্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্ত্তস্বরের মতো, অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র চামুণ্ডার মতো ফেনার জিব মেলে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে নৃত্য করছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘগুলো মরীয়া হয়ে উঠেছে যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই,—বল্‌ছে যা থাকে কপালে। আর জলে যে বিষম্ গর্জ্জন উঠ্‌ছে, তাতে মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না, এমনি বোধ হতে লাগল। মাল্লারা ছোটো ছোটো লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে চলাচল কর্‌ছে,—কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সঙ্কেত-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর্‌লুম। কিন্তু বাহিরে জল-বাতাসের গর্জ্জন, আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণ-মন্ত্র ক্রমাগত বাজতে লাগল। আমার ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ঐ ঝড় এবং ঢেউয়ের মতোই এলোমেলো মাতামাতি কর্‌তে থাক্‌ল,—ঘুমচ্ছি কি জেগে আছি বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।

রাগী মানুষ কথা কইতে না পার্‌লে যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, সকাল-বেলাকার মেঘগুলোকে তেম্‌নি বোধ হল। বাতাস কেবলই শ ষ স, এবং জল কেবলি বাকি অন্তস্থ বর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে

দিলে, আর মেঘগুলো জটা ছুলিয়ে ভ্রূকুটি করে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বাণী জল-ধারায় নেবে পড়্‌ল। নারদের বীণা-ধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গা-ধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু এ কোন্ নারদ প্রলয়-বীণা বাজাচ্ছে? এর সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গীর-যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রঙ নেই,—চারিদিক ঝাপ্‌সা, বিবর্ণ। ছেলে-বেলায় আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে-ঘড়া উঠেছিল তার ঢাক্‌না খুল্‌তেই তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হল, সমুদ্রের নীল ঢাক্‌নাটা কে খুলে ফেলেছে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি কর্‌তে কর্‌তে আকাশে উঠে পড়্‌ছে।

জাপানী মাল্লারা ছুটোছুটি কর্‌ছে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয় সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা কর্‌ছে মাত্র;—পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ, তবু সে-সব বাধা ভেদ করে এক একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় করে এসে পড়্‌ছে, আর তাই দেখে ওরা হো হো করে উঠ্‌ছে। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখ্‌তে পেলুম না।

ঘরে আর বসে থাক্‌তে পার্‌লুম না। ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বস্‌লুম। এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেল্‌ছে না, তার কারণ জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মতো দোলায়িত অবস্থা আমাদের

জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা অনেকবার মনে হল, চারিদিকেই তো মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত মৃত্যু—আমার প্রাণ এর মধ্যে এতটুকু। এই অতি ছোটোটার উপরেই কি সমস্ত আস্থা রাখ্‌ব, আর এই এত বড়োটাকে কিছু বিশ্বাস কর্‌ব না?—বড়োর উপরে ভরসা রাখাই ভালো।

* * * * *

সন্ধ্যার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধরে যে চড়-চাপড় খেয়েছে, তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে তাঁর আসবাব-পত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ-বোট জখম হয়েছে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। জাপানী মাল্লারা এমন সকল কাজে প্রবৃত্ত ছিল যাতে প্রাণ সংশয় ছিল। জাহাজ যে বরাবর আসন্ন সঙ্কটের সঙ্গে লড়াই করেছে, তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল—জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেবার জামাগুলো সাজানো। এক সময়ে এগুলো বের কর্‌বার কথা কাপ্তেনের মনে হয়েছিল।—কিন্তু ঝড়ের পালার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট করে আমার মনে পড়ছে জাপানী মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসন্ন কিন্তু সমুদ্রের আক্ষেপ এখনো ঘোচেনি। আশ্চর্য্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি, ঝড়ের পর যেমন তার দোলা। কালকেকার উৎপাতকে কিছুতেই যেন সে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ছে না, ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠ্‌ছে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম,—ঝড়ের সময় সে একরকম শক্ত ছিল, কিন্তু পরের দিন ভুল্‌তে পার্‌ছে না তার উপর দিয়ে ঝড় গিয়েছে।

আজ রবিবার। জলের রং ফিকে হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে আকাশে একটি পাখী দেখ্‌তে পেলুম—এই পাখীগুলিই পৃথিবীর বাণী আকাশে বহন করে নিয়ে যায়—আকাশ দেয় তার আলো, পৃথিবী দেয় তার গান। সমুদ্রের যা-কিছু গান সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের—তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারো কণ্ঠে স্বর নেই—সেই অসংখ্য বোবা জীবের হয়ে সমুদ্র নিজেই কথা কচ্ছে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্ছে গতি। সমুদ্র হচ্ছে নৃত্য-লোক, আর পৃথিবী হচ্ছে শব্দ-লোক।

সমুদ্রের রঙ

২ জ্যৈষ্ঠ। জগতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সামান্য ব্যাপার নয়, তার অভ্যর্থনার জন্যে স্বর্গ মর্ত্ত্যে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী তার ঘোম্‌টা খুলে দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে জেগে ওঠে; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায়, এবং দ্যুলোকে আপন জ্যোতিরোমাঞ্চিত নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণের উত্তর দেয়। স্বর্গ-মর্ত্ত্যের এই মুখোমুখি আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা আমরা বুঝ্‌তে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখ্‌তে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গীতে আকাশে উঠে চলেছে যেন সৃষ্টিকর্ত্তার আঙিনার আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। যেমন আকৃতির হরির লুঠ, তেম্‌নি রঙের। রং যে কত-রকম হতে পারে, তার সীমা নেই। রঙের তান উঠ্‌ছে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন, তাদের অমিলও তেম্‌নি; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন প্রকৃতির বিলাস, রঙের

শান্তিতেও তেম্‌নি। সূর্য্যাস্তের মুহূর্ত্তে পশ্চিম আকাশ যেখানে রঙের ঐশ্বর্য্য পাগলের মতো দুই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেও যেমন আশ্চর্য্য, পূর্ব্ব আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম, সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য্য। প্রকৃতির হাতে অপর্য্যাপ্তও যেমন মহৎ হতে পারে, পর্য্যাপ্তও তেম্‌নি; সূর্য্যাস্তে সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সঙ্গে বাজ্‌তে থাকে, অথচ কেউ কারো মহিমাকে আঘাত করে না।

তারপরে, রঙের আভায়-আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বল্‌তে পারে তা কেমন করে বর্ণনা কর্‌ব? সে তার জল তরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে-সময়ে তার প্রশান্ত স্তব্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ান্‌কে দেখায়, সমুদ্র সেই সময় তার ছোটো ছোটো লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ান্‌কে দেখাতে থাকে, তখন আশ্চর্য্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

সমুদ্র-আকাশের গীতিনাট্য-লীলায় রুদ্রের প্রকাশ কী রকম দেখা গেছে, সে পূর্ব্বেই বলেছি। আবার কালও তিনি তাঁর ডমরু বাজিয়ে অট্টহাস্যে আর-এক ভঙ্গীতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুড়ে নীল মেঘ এবং ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে ফুলে উঠ্‌ল। মুষলধারে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ আমাদের জাহাজের চারদিকে তার তলোয়ার খেলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। তার পিছনে পিছনে বজ্রের গর্জ্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের সামনে জলের উপর পড়্‌ল, জল থেকে একটা বাষ্প-রেখা সাপের মতো ফোঁস করে উঠ্‌ল। আর একটা বজ্র পড়্‌ল আমাদের সামনেকার মাস্তলে। রুদ্র যেন সুইট্‌জার-ল্যাণ্ডের ইতিহাস-বিশ্রুত বীর উইলিয়ম টেলের মতো তাঁর অদ্ভুত ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়ে গেলেন, মাস্তলের ডগায় তাঁর বাণ লাগ্‌ল

আমাদের স্পর্শ করলে না। এই ঝড়ে আমাদের সঙ্গী আর-একটা জাহাজের প্রধান মাস্তল বিদীর্ণ হয়েছে শুনলুম। মানুষ-যে বাঁচে এই আশ্চর্য।

* * * *

৫ জ্যৈষ্ঠ। এই কয়দিন আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চোখ ভরে দেখছি, আর মনে হচ্ছে অন্তরের রঙ তো শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্য্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ—ততটা সে সাদা। তার পরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর, সীমার রাজ্য সেই পর্য্যন্ত; তারপরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তভ-মণির হার দুলছে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তা'র বিচিত্র রঙের সাজ পরে অভিসারে চলেছে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্ব্বচনীয় অব্যক্তর দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্ব্বস্ব করে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে-যাওয়া বিপদের যাত্রা, পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি,—সমস্তকে অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে-যে চলেছে সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তর দিকে, "আরোর" দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসার-যাত্রা,—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে তো পথের চিহ্ন নেই, কিছু তো দেখতে পাওয়া যায় না? না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত। কিন্তু শূন্য তো নয়,—কেননা ঐ দিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি, সে তো বুদ্ধিমানের চলা,—তার হিসাব আছে,

তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কূলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে চলায় মরা বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়, কোনো নজির মানতে গেলেই তাকে থম্‌কে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে-যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না; তার এই চলার কেবল একটিমাত্র কৈফিয়ৎ আছে,—সে বল্‌ছে, ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাক্‌ছে। নইলে কেউ কি সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে?

যেদিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজছে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে; ঐ দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিরাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েছে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তর-মেরু দক্ষিণ-মেরুতে টানে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বারবার মর্‌তে মর্‌তে সমুদ্র-পারের পথ বের করে, বারবার মর্‌তে মর্‌তে আকাশ-পারের ডানা মেল্‌তে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী, তারাই এগোচ্ছে,—ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্ব্বনাশা কালোর বাঁশি শুন্‌তে পেলে না, তারা কেবল পুঁথির নজির জড়ো করে কূল আঁক্‌ড়ে বসে রইল—তারা কেবল শাসন মান্‌তেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দ-লোকে জন্মেছে, যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্য লীলাই হচ্ছে জীবন যাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

আবার উল্টোদিক থেকে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই, ঐ কালো অনন্ত আস্‌ছেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ময়ী আনন্দমূর্ত্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেই জন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজ্‌ছে, অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্ছে। ঐ কালো এই রূপসীকে এক-মুহূর্ত্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখ্‌তে পারেন না,—কেননা এ-যে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটোর জন্যে বড়োর এই সাধনা যে কী অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, পাখীর পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে, মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধরা পড়েছে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের?—অব্যক্ত-যে ব্যক্তের মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ করছেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাচ্ছেন। সেই-জন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখছি, আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আস্‌ছে আলোর কূলে। আলোর মন ভুল্‌ছে কালোয়, কালোর মন ভুলেছে আলোয়।

কোবে-বন্দর

১৬ জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের "কোবে" বন্দরে পৌছ'বে। ক-দিন বৃষ্টি-বাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোটো ছোটো দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্র-যাত্রীদের ইসারা করছে—কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত ঝাঁপসা;—বাদলার হাওয়ায় সর্দ্দিকাশি হয়ে গলা ভেঙে গেলে তার আওয়াজ যে-রকম হয়ে থাকে, ঐ দ্বীপগুলোর সেই রকম ঘোরতর সর্দ্দির আওয়াজের চেহারা। বৃষ্টির ছাঁট এবং ভিজে হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে, ডেকের এধার থেকে ওধারে চৌকি টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমাদের সঙ্গে যে-জাপানী যাত্রী দেশে ফির্ছেন, তিনি আজ ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে এসেছেন, জাপানের প্রথম অভ্যর্থনা গ্রহণ কর্বার জন্যে। তখন কেবল একটি মাত্র ছোটো নীলাভ পাহাড় মানস-সরোবরের মস্ত একটি নীল পদ্মের কুঁড়িটির মতো জলের উপরে জেগে রয়েছে। তিনি স্থির নেত্রে এই-টুকু কেবল দেখে নীচে নেবে গেলেন, তাঁর সেই চোখে ঐ পাহাড়-টুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই—আমরা দেখ্‌ছি নূতনকে, তিনি দেখ্‌ছেন তাঁর চিরন্তনকে।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌঁছ'ল, তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য্য উঠেছে। বড়ো বড়ো জাপানী অপ্সরা নৌকা, আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণ-দেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্য্যদেবের নিমন্ত্রণ হয়েছে, সেইখানে নৃত্য কর্ছে। প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে বাদ্‌লার যবনিকা উঠে গিয়েছে।

* * * *

২৫ জ্যৈষ্ঠ। জাপানে সহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজ-সজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশঃ বিদায় নিচ্ছে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোষাক ছেড়ে আপিসের পোষাক ধরেছে। আজকাল পৃথিবী-জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছে, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক য়ুরোপ থেকে, সেই জন্যে এর বেশ আধুনিক য়ুরোপের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয় না, আপিস-রাজ্যের পরিচয় দেয়।

এইজন্যে জাপানের সহরের রাস্তায় বেরোলেই, প্রধানভাবে চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝতে পারি, এরাই জাপানের ঘর,

জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশ জাপানের সম্মান-রক্ষার ভার নিয়েছে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড়ো করে খাতির করেনি, সেই জন্যেই ওরা নয়ন-মনের আনন্দ।

একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা-সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এ-পর্য্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে, মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলা-গাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে,—গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিকল্ মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে—আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিকল্-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারতো না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলে না। এখানকার বাঙালীদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিকলে, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে বাইসিকলের ঠোকা-ঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয় পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না করে গায়ের ধূলা ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানী বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি করে নিজের বল-ক্ষয় করে না। প্রাণ-শক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা, ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেই জন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে—জাপানীকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশি গূঢ়। এর কারণই হচ্ছে, এরা নিজেকে সর্ব্বদা ফুটো দিয়ে, ফাঁক দিয়ে, গ'লে পড়তে দেয় না।

জাপানী কবিতা

এই-যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা,—এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সেই জন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে, এ আমি শুনিনি। এদের হৃদয় ঝর্‌নার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এ পর্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্ছে ছবি-দেখার কবিতা, গান-গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্য্য-বোধে। সৌন্দর্য্য-বোধ জিনিষটা স্বার্থ-নিরপেক্ষ। ফুল, পাখী, চাঁদ এদের নিয়ে আমাদের কাঁদা-কাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্য্য-ভোগের সম্বন্ধ—এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না—এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেই জন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের একটা বিখ্যাত পুরোণো কবিতার নমুনা দেখ্‌লে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে :—

পুরোণো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

বাস্! আর দরকার নেই। জাপানী পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোণো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়্‌তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল— এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কী-রকম স্তব্ধ। এই পুরোণো পুকুরের ছবিটা

কী-ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইসারা করে দিলে—তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক।

যাই হোক, এই কবিতার মধ্যে কেবল যে বাক্-সংযম তা নয়—এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

জাপানী ফুল-সাজানো

কাল দু-জন জাপানী মেয়ে এসে, আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে তার ঠিকানা নেই! প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সঙ্গীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে স্বগোচর, কাল আমি ঐ দু-জন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পার্‌ছিলুম।

একটা বইয়ে পড়ছিলুম, প্রাচীনকালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবকাশ-কালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যার আলোচনা কর্‌তেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে তাঁদের রণ-দক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝতে পার্‌বে, জাপানী নিজের এই সৌন্দর্য্য-অনুভূতিকে সৌখীন জিনিষ বলে মনে করে না; ওরা জানে গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণ হচ্ছে শান্তি।

চা-এর নিমন্ত্রণ

সেদিন একজন ধনী জাপানী তাঁর বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝ্‌তে

পার্‌লুম, জাপানীর পক্ষে এটা ধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটর-যানে করে গিয়ে প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ কর্‌লুম—সে বাগান ছায়াতে, সৌন্দর্য্যে এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড়-ভাবে পূর্ণ। বাগান জিনিষটা যে কী, তা এরা জানে। জাপানের চোখ এবং হাত দুইই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্য্যের দীক্ষালাভ করেছে,—যেমন ওরা দেখ্‌তে জানে, তেম্‌নি ওরা গড়্‌তে জানে। ছায়া-পথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত্ত-করা একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধুলুম। তার পরে একটা ছোট্টো ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চির উপরে ছোটো ছোটো গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে, তার উপরে আমরা বস্‌লুম। নিয়ম হচ্চে এইখানে কিছুকাল নীরব হয়ে বসে থাকৃতে হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গে যাবা-মাত্রই দেখা হয় না। মনকে শান্ত করে স্থির কর্‌বার জন্যে, ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। আস্তে আস্তে দুটো তিন্‌টে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম কর্‌তে কর্‌তে, শেষে আসল জায়গায় যাওয়া গেল। সমস্ত ঘরই নিস্তব্ধ, যেন চির-প্রদোষের ছায়াবৃত—কারো মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়া-ঘন নিঃশব্দ নিঃস্তব্ধতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠ্‌তে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌লেন।

ঘরগুলিতে আসবাব নেই বল্‌লেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ সমস্ত ঘর কী-একটাতে পূর্ণ, গম্‌গম্ কর্‌ছে। একটি-মাত্র ছবি কিম্বা একটি-মাত্র পাত্র কোথাও আছে। নিমন্ত্রিতেরা সেইটি বহুযত্নে দেখে দেখে নীরবে তৃপ্তিলাভ করেন। যে-জিনিষ যথার্থ সুন্দর, তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিষগুলিকে

ঘেঁসাঘেঁসি করে রাখা তাদের অপমান করা—সে যেন সতী স্ত্রীকে সতীনের ঘর করতে দেওয়ার মতো। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা করে করে স্তব্ধতা ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত করে তুলে, তার পরে একরকম দুটি একটি ভালো জিনিষ দেখালে, সে যে কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পার্লুম।

তার পরে গৃহস্বামী এসে বল্লেন,—চা তৈরি করা এবং পরিবেষণের ভার তিনি তার মেয়ের উপরে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে এসে, নমস্কার করে চা-তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে, চা-তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন ছন্দের মতো। ধোয়া মোছা, আগুন-জ্বালা, চা দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আস্‌বাবটি দুর্লভ ও সুন্দর। অতিথির কর্ত্তব্য হচ্ছে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত-যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত করে, নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্য্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা, ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়—কোথাও লেশমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই; মনের উপর-তলায় সর্ব্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলি ঢেউ উঠছে,—তার থেকে দূরে, সৌন্দর্য্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে দেওয়াই হচ্ছে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য।

এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে সৌন্দর্য্য-বোধ, সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিষটা অন্তরে বাহিরে কেবল

খরচ করায়, তাতেই দুর্ব্বল করে। কিন্তু বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-বোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে। সেই জন্যেই জাপানীর মনে এই সৌন্দর্য্য-রসবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে।

জাপানের সৌন্দর্য্য-বোধ

একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম। মনে হল এ যেন দেহ-ভঙ্গীর সঙ্গীত। এই সঙ্গীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ পদে পদে মীড়। ভঙ্গী-বৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না ;—সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো এক সঙ্গে দুল্‌তে দুল্‌তে সৌন্দর্য্যের পুষ্পবৃষ্টি কর্‌ছে।

কিন্তু এদের সঙ্গীতটা আমার মনে হল বড়ো বেশিদূর এগোয় নি। বোধ হয় চোখ আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না।

অসীম যেখানে সীমার মধ্যে, সেখানে ছবি। অসীম যেখানে সীমা-হীনতায়, সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর একটা দিকে সুর ; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাপানী রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করেছে। যা-কিছু চোখে পড়ে, তার কোথাও জাপানীর আলস্য নেই, অনাদর নেই ; তার সর্ব্বত্রই সে একেবারে পরিপূর্ণতার সাধনা করেছে। অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপ রসের যে বোধ দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। য়ুরোপে সার্ব্বজনীন বিদ্যা-শিক্ষা আছে, সার্ব্বজনীন সৈনিকতার চর্চ্চাও সেখানে অনেক জায়গায়

প্রচলিত,—কিন্তু এমনতরো সার্ব্বজনীন রস-বোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েছে? অকর্ম্মণ্য হয়েছে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিম্বা অক্ষম হয়েছে?—ঠিক তার উল্টো। এরা এই সৌন্দর্য্য-সাধনা থেকেই মিতাচার শিখেছে। এই সৌন্দর্য্য-সাধনা থেকেই এরা বীর্য্য এবং কর্ম্ম-নৈপুণ্য লাভ করেছে।

জাপানী ছবি

হারার বাড়িতে টাইক্কানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে সৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে, তেমনি সংযম। বিষয়টা এই; চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে-ভোর হয়ে চলেছে—তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাযন্ত্র বহু যত্নে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার নেই; তার পিছনে একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিন-ভাগ-ওয়ালা যে খাড়া পর্দ্দার প্রচলন আছে, সেই রেশমের পর্দ্দার উপর আঁকা। মস্ত পর্দ্দা এবং প্রকাণ্ড ছবি। প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা। এর মধ্যে ছোটোখাটো কিম্বা জবর-জঙ্গ কিছুই নেই—যেমন উদার, তেম্নি গভীর, তেম্নি আয়াসহীন। নৈপুণ্যের কথা একেবারে মনেই হয় না—নানা রঙ, নানা রেখার সমাবেশ নেই—দেখবামাত্র মনে হয় খুব বড় এবং খুব সত্য। তার পরে তাঁর ভূদৃশ্য-চিত্র দেখলুম। একটি ছবি,—পটের উচ্চ-প্রান্তে একখানি পূর্ণচাঁদ, মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের ডাল দেখা যাচ্ছে—আর কিছু না—জলের কোনো রেখা পর্য্যন্ত নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় স্থির জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুভ্রতা,—এটা-যে জল, সে কেবলমাত্র ঐ

নৌকা আছে বলেই বোঝা যাচ্ছে; আর এই সর্ব্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোল্‌বার জন্যে যত কিছু কালিমা,—সে কেবলি ঐ দুটো পাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে আঁক্‌তে চেয়েছেন,যার রূপ নেই,যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ—জ্যোৎস্না-রাত্রি,—অতল-স্পর্শ তার নিঃশব্দতা। কিন্তু আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা কর্‌তে যাই, তা হলে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলোবে না। হারা-সান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সঙ্কীর্ণ ঘরে, সেখানে একদিকের প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি খাড়া পর্দ্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দ্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে—প্লাম গাছের ডালে একটিও পাতা নেই, শাদা শাদা ফুল ধরেছে, ফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরে ঝরে পড়্‌ছে;—বৃহৎ পর্দ্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য্য দেখা দিয়েছে—পর্দ্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি অন্ধ হাত-জোড় করে সূর্য্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য্য, আর সোনায়-ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ—এমন ছবি আমি কখনো দেখিনি। উপনিষদের এই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধরে আমার কাছে দেখা দিলে,—তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা—তমসো মা জ্যোতির্গময়—সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠ্‌ছে। অথচ আলোয় আলোময়—তারি মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

জাপানের মন

চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি এসিয়ার এই প্রান্তরবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং

নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার কর্‌তে পার্‌ছে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাকেই নিয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েছে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত, নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিট্‌ত না, এবং বর্ম্ম ওদের দেহটাকে পিষে দিত।

য়ুরোপের সভ্যতা একান্ত-ভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেছে। এসিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম্ম থাকাতেই, জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্র-তালে চল্‌তে পেরেছে, এবং তাতে-করে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছু পাচ্ছে, তার দ্বারা সে সৃষ্টি করছে; সুতরাং নিজের বর্দ্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারছে। এই সমস্ত নতুন জিনিষ যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্ছে না, তা নয়,—কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম যা অসঙ্গত অদ্ভুত হয়ে দেখা দিচ্ছে, ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্ত্তন ঘটে সুসঙ্গতি জেগে উঠ্‌ছে।

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্ম্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ কর্‌ছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ কর্‌তে বসেছে। কিন্তু আমি যতটা দেখেছি তাতে আমার মনে হয়, য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে-গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্ম্ম-নৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূল-গত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে-সাধনা অমৃত-লোককে মানে, এবং সেই অভিমুখে চল্‌তে থাকে,

যে-সাধনা কেবল-মাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, সে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতি-গত স্বার্থকেও অতিক্রম করে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেছে—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানী সভ্যতার সৌধ এক-মহলা—সে হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব চেয়ে বড় জিনিষ যা সঞ্চিত হয়, সে হচ্ছে কৃতকর্ম্মতা,—সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড় দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্ম্মণির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্য্যন্ত জাপান ভাল করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্ম্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং সে ধর্ম্মটা কী। কিছু দিন এমনও তার সঙ্কল্প ছিল যে, সে খৃষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে য়ুরোপ যে-ধর্ম্মকে আশ্রয় করেছে, সেই ধর্ম্ম হয়তো তাকে শক্তি দিয়েছে—অতএব খৃষ্টানীকে কামান-বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে যে, খৃষ্টান-ধর্ম্ম স্বভাব-দুর্ব্বলের ধর্ম্ম, তা বীরের ধর্ম্ম নয়। য়ুরোপ বল্‌তে সুরু করেছিল—যে-মানুষ ক্ষীণ, তারই স্বার্থ নম্রতা ক্ষমা ও ত্যাগ-ধর্ম্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত, সে-ধর্ম্মে তাদেরই সুবিধা; সংসারে যারা জয়শীল, সে-ধর্ম্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেছে। এইজন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করছে। সে জান্‌ছে পরকালের দাবী থেকে সে মুক্ত এই জন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মতো এক-মহলা নয়।

তার একটি অন্তর-মহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom of Heavenকে স্বীকার করে আস্‌ছে। সেখানে নয় যে, সে জয়ী হয়; পর যে, সে আপনার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে। কৃত-কর্ম্মতা নয়, পরমার্থ ই সেখানে চরম সম্পদ।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তর-মহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জলে না। তা হোক কিন্তু এ-মহলের পাকা ভিৎ,—বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙ্‌তে পার্‌বে না—শেষ পর্য্যন্তই এ টি\'কে থাক্‌বে এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও মিল যদি না থাকে, এই বড় জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশি মানি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তর-মহলে, য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পদচিহ্ন দেখ্‌তে পাই। এই অন্তর-মহলে মানুষের যে-মিলন, সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর্‌বার কাজে বাঙালীর আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে।

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী

হারুনা-মারু জাহাজ

৩ অক্টোবর, ১৯২৪। এখনো সূর্য ওঠেনি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব আকাশে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো বারে বারে?

বুঝতে পারলুম, আমার কোনো একটি কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের দূর তীরে যে-ধরা আপনার নানা-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পূবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খসে, কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল; তাল-তমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, নুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে-পড়া এলোচুল।

আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি। সেই একখানির বেশি দরকার নেই; সেই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়ো,

তাই সে এত সরল। সেই একখানিতেই সব আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ কর্‌ছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখ্‌ছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে কণ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠ্‌ল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিঃশ্বসিত। ঐকটি চিঠির সেই একটি কথা,—সেই আলো। সেই স্নুন্দর, সেই ভীষণ সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত,—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দুজনের কথা এসে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা, দূর-নিকটের ভেদ না ঘট্‌লে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি-উৎসবের মুখে কী একটা কাণ্ড আছে, সে এক-ধারাকে দুই-ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে দুখানি কচি পাতা বেরোল, তখনি সেই বীজ পেল তার বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য্য আপনি ভোগ কর্‌তে জানে না। জীব ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে সে দুই হয়ে গেল। তখনি তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাক-বিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ, এ নইলে সব চুপ, সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা, একটা আকাঙ্ক্ষার টান টন্‌-টন্‌ করে উঠ্‌ল, দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এ-পারে ও-পারে চালাচালি হতে লাগ্‌ল। এতেই দুলে উঠ্‌ল সৃষ্টি-তরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতু-পর্য্যায়; কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো শীতের সঙ্কোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য।

একে যদি মায়া বলো তো দোষ নেই, কেননা এই চিঠি-লিখনের

অক্ষরে আব্ছায়া, ভাষায় ইসারা;—এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পূরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন্ আকাশ-পথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়; মনে ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছু কাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্ এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজ্ছে। যে-উত্তাপটা ফেরার হয়েছে বলে সেদিন রব উঠ্ল সেই তো মাটির তলায় অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এম্নি করেই কত অদৃশ্য ইসারার উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্ চোর-কোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানিনে, তার পরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে, "এসেছি"।

আমার সহযাত্রী বন্ধু আমার ডায়ারি পড়ে বল্লেন, "তুমি ধরণীর চিঠি পড়ায় আর মানুষের চিঠি পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েছ। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহী বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তোমার এই লেখায় কোন্খানে রূপক কোন্খানে শাদা কথা বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে।" আমি বল্লুম, "কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার একপ্রান্তে নির্ব্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে? স্বর্গ-মর্ত্ত্যের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তাছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠ্ছে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অনু-পরমাণু নিত্যই যে অদৃশ্য চিঠি চালা-চালি করে, সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক্, কানে-কানেই হোক্, মনে-মনেই হোক্, আর কাগজে-পত্রেই হোক্, যে চিঠি চলে সেও ঐ বিশ্ব-চিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
এক-ই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে ?
প্রত্যূষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্ণে লিখা
প্রভাতের মর্ম্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি করো যে মুগ্ধ মনে ॥

বহু যুগ হয়ে গেল কোন্ শুভক্ষণে
বাষ্পের গুণ্ঠন-খানি প্রথম পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
অমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।
রোমাঞ্চিত বুকে
পরম বিস্ময় তব জাগিল তখনি।
নিঃশব্দ বরণ-মন্ত্রধ্বনি
উচ্ছ্বসিল পর্ব্বতের শিখরে শিখরে।
কল্লোলাসে উদ্ঘোষিল নৃত্য-মত্ত সাগরে সাগরে
জয়, জয়, জয়।
ঝঞ্ঝা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়,
"জাগো রে জাগো রে",
বনে বনান্তরে ॥

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো-যে কাঁপে বক্ষোময়।
তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি,
তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি
ঊর্দ্ধে চেয়ে কয়—
জয়, জয়, জয়।
সে-বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে ;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয় ;
সে-বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জ্জি উঠি কয়,—
জয়, জয়, জয়॥

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান,
ঊর্দ্ধ হতে তাই নামে গান।
চির-বিরহের নীল পত্রখানি'পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তারে রাখো,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকো ;
বাক্যগুলি
পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি,—
মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে ;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে
বন্দী করো তারে ;
তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে

রাখো তারে ভরি,
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি, নারিকেল-পল্লবে মর্ম্মরি
সে-বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে ;
মধ্যাহ্নে শোনো সে-বাণী অরণ্যের নির্জ্জন নির্ঝরে ॥

বিরহিণী সে-লিপির যে-উত্তর লিখিতে উন্মনা
আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।
যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ফেলো ; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে ;
অবশেষে একদিন জলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে,
আত্ম-বিদ্রোহের অসন্তোষে।
তার পরে আর বার বসে বসে
নূতন আগ্রহে লেখো নূতন ভাষায়।
যুগযুগান্তর চলে যায় ॥

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে-লিপির লিখনে
বসে গেছে একমনে।
শিখিতে চাহিছে তব ভাষা,
বুঝিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।
তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে।
চাও মোর পানে

লিপি

চকিত ইঙ্গিত তব, বসন প্রান্তের ভঙ্গীখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।
শরতে দিগন্ত-তলে
ছলছলে
তোমার যে অশ্রুর আভাস,
আমার সঙ্গীতে তারি পড়ুক নিঃশ্বাস।
অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে
কটিতটে যে-কলকিঙ্কিণী,
মোর ছন্দে দাও ঢেলে তারি রিনিরিনি,
ওগো বিরহিণী।
দূর হতে আলোকের বরমালা এসে
খসিয়া পড়িল তব কেশে,
স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে
ওঠে যে-ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।
স্বর্গ হতে মিলনের সুধা
মর্ত্যের বিচ্ছেদ পাত্রে সঙ্গোপনে রেখেছো, বসুধা;
তারি লাগি নিত্যক্ষুধা,
বিরহিণী অয়ি,
মোর সুরে হোক জ্বালাময়ী।

৪ অক্টোবর, ১৯২৪
